দেশ কাল মানুষের

নাগরিক

আজ কাল পরশু

প্রথম বর্ষ ●১৩ তম সংখ্যা ●২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ভিতরের পাতায়

- এ আন্দোলন কি পারবে ভিতে আঘাত করতে - ২
- অভয়ার মর্মান্তিক ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক গণ আন্দোলন ঃ যার ফল সুদুরপ্রসারী হতে বাধ্য - ৪
- প্রসঙ্গ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ - ৫
- নাগরিক স্মৃতিচারণা ঃ এস ওয়াজেদ আলি ও বিশ শতকের উত্তরাধিকার - ৮
- অন্য চোখে কাশ্মীর - ১১
- জম্মু ও কাশ্মীরে ১০ বছর পর বিধানসভা নির্বাচন - ১৩
- ভারতের বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা - ১৪
- জাতীয় শিক্ষক দিবসের আলোকে বাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি - ১৫
- গ্রেপ্তার হলেন শাহরিয়ার কবীর ! পথের দখল নিয়েছে ৭১ এর ঘাতক ও দালালরা ঃ কোথায় চলেছ তুমি, বাংলাদেশ? - ১৭
- বাংলাদেশের ১৯৩ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে খুনের মামলা - ২০
- চিত্রনায়ক নাঈম ঢাকায় জিন্নাহর মৃত্যুবার্ষিকী পালন নিয়ে যা লিখলেন - ২১
- আচার্য বিনোবা ভাবে প্রতিষ্ঠিত সর্বসেবা সংঘের প্রতিবাদী সত্যাগ্রহ - ২২
- চার বছর জেলবন্দি উমর খালিদ - ২৩
- স্মরণ ঃ প্রাবন্ধিক-গবেষক গোলাম মুরশিদের জীবনাবসান - ২৪
- সিপিআই (এম) নেতা সীতারাম ইয়েচুরি (১৯৫২-২০২৪) - ২৫

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com

ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

অভয়ার প্রতি ন্যায় বিচার ও নারীদের স্বাধীনতা

৯ আগস্ট ভোর রাতে আর.জি. কর হাসপাতালে আমাদের ঘরের মেয়ে অভয়ার ওপর নৃশংস অত্যাচার করে তাঁকে হত্যা করা হয়। ওই দিনটি আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। আগস্ট বিপ্লব দিবস। ওই দিন অত্যাচারী বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সারা দেশ গর্জে উঠেছিল। আমরা সেই দিনগুলি দেখিনি। এরই পাঁচ বছর পর ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়। ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে শোনা যায় গোটা কলকাতা শহর রাস্তায় নেমে এসেছিল। কিন্তু সেটা ছিল আনন্দের দিন। কিন্তু গত ১৪ আগস্ট মধ্য রাত্রে অভয়ার প্রতি ন্যায় বিচার, দোষীদের গ্রেফতার ও কঠোরতম শাস্তির দাবিতে যে কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে কলকাতাসহ সারা পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা রাত দখলের জন্য রাস্তায় নেমে আসলেন তা ছিল প্রতিবাদের রাত। এক কথায় অভূতপূর্ব। এই হচ্ছে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। আর এই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান দাবি হচ্ছে 'অভয়ার প্রতি ন্যায় বিচার' ও 'নারীদের স্বাধীনতা।'

কোনও হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এই দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপথগামী করতে পারেনি। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের বার্তা রাজ্যের ও দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিদিনই অসংখ্য এলাকায় অসংখ্য মিছিল বেরোচ্ছে। ন্যায় বিচারের দাবিতে এই সব প্রতিবাদ মিছিলের বৈচিত্র্য ও বিপুল অংশগ্রহণ দেখলে বিস্মিত হতে হয়।যাঁরা এইসব প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করছেন তাঁরা বিরামহীন , কোনও ক্লান্তি তাঁদের স্পর্শ করছে না। বারাসত থেকে R. G. Kar মানব বন্ধন বা হাই ল্যান্ড পার্ক থেকে R. G. Kar দৃপ্ত মশাল মিছিল এই বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে যে দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হবেই।

কোনও শক্তিই নেই যা ন্যায় বিচার ও নারী স্বাধীনতাকে প্রতিহত করতে পারে।

এ আন্দোলন কি পারবে ভিতে আঘাত করতে

মিলন দত্ত

আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলন গ্রাম-শহর সর্বত্র যে জনজাগরণ দেখা যাচ্ছে তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সল্টলেকের স্বাস্থ্যভবনের সামনে জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাধারণ মানুষের যে ঢল নামে তাও ঐতিহাসিক। এই দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় দিল্লির কৃষক আন্দোলনের কথা। খাবার, জল, ওষুধ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে মানুষ উপস্থিত হয়েছেন প্রতিদিন। দরকার নেই, বলে আন্দোলনকারী ডাক্তাররা অনেক কিছু ফিরিয়ে দিলেও মানুষ থামেনি। ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে একটানা বৃষ্টি শুরু হলে বহু মানুষ বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন আন্দোলনকারী ছেলেমেয়েদের জন্য দুশ্চিন্তায়। অনেকে চৌকি, পাটাতন, ফোম, ত্রিপল জোগাড় করে পৌঁছে গেছেন আন্দোলনকারীদের দিতে। চাকরিজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসকরাই শুধু নন, ফেরিওয়ালা, হকার, অনলাইন খাবার ডেলিভারি বয় থেকে শুরু করে খবরের কাগজ বিক্রেতারাও তাঁদের রোজগারের টাকা তুলে দিয়েছেন আন্দোলনকারীদের হাতে। এই ঘটনা দেখিয়ে দিল ন্যায়সঙ্গত দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন কী ভাবে গোটা সমাজে জাগরণ আনতে পারে, পারে মনুষ্যত্বের স্ফূরণ ঘটাতে। জীবনযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে হতাশায় ভুগতে থাকা মানুষও যে সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে আন্দোলনে এগিয়ে আসেন; দেখিয়ে দিল এই ঐতিহাসিক সময়।

একটা আন্দোলনে হার হল নাকি জিত হল সেটা কেবল কটা দাবী আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। আংশিক জয় বা পরাজয় একটা সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায় না। মূল কথা হচ্ছে আন্দোলনকারীরা সেই জয়কে তাদের জয় বলে ভাবছে কিনা, আন্দোলনের সমর্থন যাঁরা করছেন তাঁরা আরও শক্ত করে আন্দোলনকারীদের পক্ষে দাঁড়ানোর কথা ভাবছেন কিনা, এবং আন্দোলনের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে কিনা।

আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনার পরে যে অভাবনীয় গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে তা বহু বছর ধরে এই বাংলার গড়ে ওঠা বড় বড় গণআন্দোলনের থেকে একেবারেই আলাদা। আমরা যে আন্দোলনগুলো নিয়ে আলোচনা করি সেগুলো গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে। এই প্রথম একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছে যা বাহ্যত রাজনৈতিক আন্দোলন না হলেও অন্তর্বস্তুতে তা শতভাগ রাজনৈতিক। সে দিক থেকে এটা অভূতপূর্ব। কিন্তু কোন কেন্দ্রীয় বা দলীয় নেতৃত্ব ছাড়া। তা সত্বেও এই আন্দোলন বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে, যা একেবারেই গণতন্ত্রের একেবারে মৌলিক বিষয়। সবচেয়ে বড় কথা গত প্রায় দুই দশক ধরে সংবাদমাধ্যম এবং অন্যত্রও বিজেপি-তৃণমূলের যে বাইনারি চলছিল তা পুরোপুরি ভেঙ্গে দিয়েছে এই আন্দোলন। এ আন্দোলনে অনেক দুর্বলতা আছে ঠিকই , সেটাও চিহ্নিত করতে হবে। এই নিরিখেই জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে বুঝতে হবে।

দু'একটা মেডিকেল কলেজ বাদ দিলে প্রায় সব মেডিকেল কলেজে ছিল তৃণমূলের একাধিপত্য। নির্বাচনের বালাই নেই, কিন্তু রাজত্ব সেই তৃণমূলেরই। অভয়াকে খুন ও ধর্ষণের ঘটনার পরেও জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে ভয় ও দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল। পরে তারা সমাজের নানা শ্রেনীর মানুষের প্রতিবাদে উজ্জিবীত হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর পথে এগিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ওদের মঞ্চে আসতে বাধ্য হয়েছেন তিনবার বৈঠক ব্যর্থ হবার পর। চতুর্থ বারের বৈঠকে কিছু দাবী মেনেছেন। অথচ এরা প্রথম যখন স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করেছিল, স্বাস্থ্য সচিব খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। অবস্থা এখন এমন যে স্বাস্থ্য সচিবকে সভায় রাখার সাহস মমতা দেখাতে পারেননি। এই আন্দোলন কি পেল কি পেল না, সেটার চেয়েও এটা বড় কথা হল, তারা একজন উদ্ধত শাসকের মাথা নুইয়ে দিয়েছে। যা গত তের বছরে কেউ করতে পারেনি। মমতা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ন্যুনতম নিয়মও মানেন না। যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংবিধানে অনুমোদিত তা অনবরত পদদলিত করতে তাঁর বিন্দুমাত্র বাধেনা। কোনও সমস্যা আলোচনা করে সমাধান করার কথা ভাবতেই পারেন না। কিছু হলে নিজেই সব সমাধান ঘোষণা করে দেন। সেই মমতা আলোচনা করার জন্য হা পিত্যেস করে বসে আছেন দেখেও অবাক হতে হয়।

গোটা রাজ্যে এই অভাবনীয় আন্দোলন আগামী দিনে কি সম্ভাবনা সামনে নিয়ে এসেছে সে অনেক আলোচনা পর্যালোচনার বিষয়। কিন্তু অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনে গ্রাম-শহর সর্বত্র যে জনজাগরণ দেখা যাচ্ছে তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সল্টলেকের স্বাস্থ্যভবনের সামনে জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাধারণ মানুষের যে ঢল নামে তাও ঐতিহাসিক। এই দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় দিল্লির কৃষক আন্দোলনের কথা। খাবার, জল, ওষুধ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে মানুষ উপস্থিত হয়েছেন প্রতিদিন। দরকার নেই, বলে আন্দোলনকারী ডাক্তাররা অনেক কিছু ফিরিয়ে দিলেও মানুষ থামেননি। ১৩

সেপ্টেম্বর থেকে একটানা বৃষ্টি শুরু হলে বহু মানুষ বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন আন্দোলনকারী ছেলেমেয়েদের জন্য দুশ্চিন্তায়। অনেকে চৌকি, পাটাতন, ফোম, ত্রিপল জোগাড় করে পৌঁছে গেছেন আন্দোলনকারীদের দিতে। চাকরিজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসকরাই শুধু নন, ফেরিওয়ালা, হকার, অনলাইন খাবার ডেলিভারি বয় থেকে শুরু করে খবরের কাগজ বিক্রেতারাও তাঁদের রোজগারের টাকা তুলে দিয়েছেন আন্দোলনকারীদের হাতে। এই ঘটনা দেখিয়ে দিল ন্যায়সঙ্গত দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন কী ভাবে গোটা সমাজে জাগরণ আনতে পারে, পারে মনুষ্যত্বের স্ফূরণ ঘটাতে। জীবনযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে হতাশায় ভুগতে থাকা মানুষও যে সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে আন্দোলনে এগিয়ে আসেন; দেখিয়ে দিল এই ঐতিহাসিক সময়। বারাসত মেডিক্যাল কলেজ থেকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত ৩৩ কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে যে মানববন্ধন হয়েছে সেখানেও ঢল নেমেছিল মানুষের। এমন মানববন্ধন এ বাংলা দেখেনি।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও হুমকির যে নোংরা সংস্কৃতি চলছে তার বিরুদ্ধে এতদিন ধরে বারবার নানা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা লড়েছেন। চিকিৎসকদের নানা সংগঠনও তা বলেছেন। অভয়ার বিচারের দাবিতে আন্দোলনের অভিঘাত তাকে একেবারে সামনে এনে দিয়েছে। যে ভয়াবহ দুর্নীতির কথা শোনা যাচ্ছে তা যে অমূলক নয়, তা আরও বোঝা গেল মুখ্যমন্ত্রী যখন জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনস্থলে দাঁড়িয়ে সমস্ত হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতিগুলি ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণায়। বোঝা যাচ্ছে, এই বিষচক্রের কথা তাঁর অজানা ছিল না। তিনি কোনও টেন্ডারে সই করেছেন কি না সেটা বড় কথা নয়, তাঁর দফতরের এই দুর্নীতি দূর করার বিষয়ে তিনি কী করছেন এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্যই জুনিয়র ডাক্তাররা আলোচনার স্বচ্ছতা চেয়েছিলেন।

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, জুনিয়ার ডাক্তাররা যে বলছেন এই আন্দোলন শুধু ডাক্তারদের আন্দোলন নয়। সমাজের আন্দোলন। সামাজিক আন্দোলন। কিন্তু সমাজের সকল স্তরের যে অংশ তিলোত্তমার বিচারের দাবীতে চাপে ফেলেছে এই সরকারকে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া এই আন্দোলন কি এগিয়ে যেতে পারে?

যেমন, সল্টলেকের অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীরা খাবার সরবরাহ করছেন দিন রাত এক করে। এই আন্দোলনকে দীর্ঘমেয়াদী চেহারা দিতে হলে এই মানুষগুলিরও প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই প্রয়োজন। যাতে তাঁরা টেনে আনতে পারেন আরো আরো শ্রমজীবি মানুষকে। যে রিক্সা শ্রমিকরা আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল করলেন, জেলায় জেলায় যারা উদ্যোগ নিলেন রাত জাগলেন তাঁদের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কিভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া যাবে?

তৃণমূল কংগ্রেসের পোষা লোকজন কিন্তু ইতিমধ্যেই নোংরা খেলায় নেমে পড়েছে। পুজো পর্যন্ত যাতে আন্দোলন গড়াতে না পারে তার জন্য তারা নামাতে চলেছে হকার্স সংগঠনকে। দেখাতে চাইবে গরীবের পেটে লাথি মেরে চলছে এই আন্দোলন। তিলোত্তমার বিচারের দাবীতে যে আন্দোলন তাতে যদি শ্রমজীবি মানুষের উপস্থিতি জোরদার হয়, যদি অন্যান্য জেলার প্রতিনিধিদের উপস্থিতি, অন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি শক্তিশালী হয় তবেই কিন্তু ঠেকানো যাবে এই মিথ্যা প্রচার।

অনেকেই মনে করছেন, যত বেশী করে এই আন্দোলনকে 'জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন' হিসাবে সরকার ও মিডিয়া দেখাতে পারবে ততই সুবিধা হবে শাসকের। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে আছে স্বাস্থ্য সিন্ডিকেট তৈরী হওয়ার প্রশ্ন। প্রতিটি জেলায় প্রতিটি হাসপাতালে রয়েছে সন্দীপ ঘোষদের মত দুর্বৃত্ত। যাদের হাত ধরে চলে এই চোরাকারবার। যাদের হাতে মৃত্যু হয়েছে আমাদের প্রিয় বোনটির। এটি শুধু ধর্ষণ নয়; একটি রাজনৈতিক হত্যা। একজন স্বাস্থ্যসচিব বা উচ্চপদাধিকারী সরে গেলেই যে এই ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন হবে না তা সবাই জানেন।

শুধু আরজি কর কেন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরে বন্ধ আছে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া। যার হাত ধরে মাটি শক্ত করেছে এই তৃণমূলী দূর্বৃত্তরা। কলেজে কলেজে স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবী ছাড়া কিভাবে সম্ভব অভীক দে বা বিরুপাক্ষদের মত দানবদের সমূলে উচ্ছেদ করা? ধূর্ত মমতা সময় কিনছেন। যাতে আইনি ও রাজনৈতিক সব দিক দিয়ে সে ঘিরতে পারে এই আন্দোলনকে। বহুকাল গণআন্দোলন করে আসা ঐ মহিলা জানেন যে, কোনো আন্দোলনে সময়ই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

দীর্ঘ এক মাসের বেশি সময় ধরে সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি থেকে যে আন্দোলনকে দূরে রাখা গেছে তা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু আবারও বলতে হবে তিলোত্তমার মৃত্যু একটি রাজনৈতিক হত্যা। তাকে যারা নৃশংসভাবে মেরেছে, ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত তারা রাজনৈতিক শক্তি। তাদের উলঙ্গ করতে গেলে রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোকেই জোরদার করতে হবে। আর একই সঙ্গে বাড়াতে হবে নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বও, সমাজের সকল স্তর থেকে। তবেই এই আন্দোলন প্রকৃত অর্থে সামাজিক আন্দোলন হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন আন্দোলনের

অনেক শুভানুধ্যায়ী।

ইরানে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে গোটা দেশজুড়ে হিজাববিরোধী ওই বিশাল শক্তিশালী অভ্যুত্থানের পরও শাসককে নড়ানো যায়নি। শাসক তখনই নড়ে যখন তার ভিত কেঁপে ওঠে।

সেই ভিতে আঘাত করুন বন্ধুরা।

(ঋণ কুশল দেবনাথ আর হোয়াটসঅ্যাপের কিছু অনামা লেখা)

অভয়ার মর্মান্তিক ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক গণ আন্দোলন ঃ যার ফল সুদুরপ্রসারী হতে বাধ্য

অমিতাভ সিংহ

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র ডক্টর দের বৈঠক বার চারেক বিভিন্ন কারণে ভেস্তে যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত ৩৮ দিনের আন্দোলন শেষের সূচনার পর যেভাবে মমতা ব্যানার্জীর মত আত্মম্ভরি নেত্রী জুনিওর ডক্টরদের দাবী প্রায় সবই মেনে নিলেন তাতে বোঝা গেল যে তার পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। তিনি বুঝতে পারেন নি গত তেরো বছর ধরে যে ভয়ের বাতাবরণ তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা ভেঙে গিয়েছে।

বিভিন্ন হাসপাতালে তৃণমূলীদের সর্বক্ষেত্রে দাদাগিরি, মাস্তানি, অর্থের বিনিময়ে ডাক্তারি ছাত্রদের পরীক্ষায় ভাগ্যনির্ণয়,পোস্টিং এর ক্ষেত্রে তৃণমূলের সমর্থক হওয়ার শর্ত,কথায় কথায় ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি যাকে থ্রেট কালচার বলা হচ্ছে ইত্যাদি নিয়ে ডাক্তার সমাজের বিদ্রোহ, কর্মবিরতির মাধ্যমে সারা রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নাগরিক সমাজের যেভাবে সমর্থন আদায় করে নিয়েছিল তার থেকে বেরিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রীকে মাথা নত করে হঠাৎ করে আন্দোলনকারীদের মঞ্চে এসে পুনরায় আলোচনার প্রস্তাব একটা আত্মরক্ষামূলক কৌশল হিসাবে দেখা যেতে পারে। মধ্যরাত্রে স্বাধীনতার কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু 'মধ্যরাত্রে সমাধানসূত্র' একটি নতুন শব্দবন্ধ, নিশ্চই একটা নাটকীয় ঘটনা এরাজ্যের ইতিহাসে। কারণ ঠিক আগেরদিন রাত্রে আন্দোলনকারীরা মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে তার কালীঘাটের বাসভবন পর্যন্ত যাওয়া সত্ত্বেও বৈঠক বাতিল হয়েছিল। তার আগেও নবান্নতে বৈঠক হয়নি লাইভ স্ট্রিনিং করতে না দেওয়ার কারণে। তখন তিনি পদত্যাগ করার কথা বললেও পৃথিবীর কেউই তাতে বিশ্বাস করেন নি। তাই শেষপর্যন্ত 'মধ্যরাত্রে সমাধানসূত্র' বিশেষ একটা ঘটনা হিসাবে পরিগণিত হওয়ার কারণ এটাই। 'ওয়ান স্টেপ ফরোয়ার্ড, টু স্টেপ ব্যাক।' তাই তিনিও একই পথের পথিক হলেন বেশ কয়েকজন অতি উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাকে বর্তমান দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে। যা আন্দোলনকারীরা প্রথম থেকেই দাবী করছিলেন। নগরপাল বিনীত গোয়েল অপসারিত হলেন পুলিশী ব্যার্থতার জন্য। তার দপ্তরের অফিসাররা নির্যাতিতার ধর্ষণ ও হত্যার প্রমাণ লোপাট অভিযোগে দোষী। সহ নগরপাল(নর্থ) অভিষেক গুপ্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নির্যাতিতার মা বাবাকে টাকা দিয়ে চেপে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ও স্বাস্থ্য অধিকর্তা সরলেন ডাক্টারি পড়ুয়াদের টাকা দিয়ে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার চক্র চালানোসহ থ্রেট সিন্ডিকেটের অংশ হিসাবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন দুর্নীতি যেমন বর্জ্যের একটা অংশ নষ্ট না করে বাইরে বিক্রি ইত্যাদি কারণে। অপসারনের দাবী উঠেছিল স্বাস্থ্য অধিকর্তার বিরুদ্ধে। এইসবের দায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর নিজেরও। তিনি এই চার আমলাকে সাময়িক স্থানান্তরিত করে সযত্নে নিজের দায় এড়িয়ে গেলেন। ছাত্ররা আর তার পদত্যাগ চাইলেনও না। স্বাস্থ্য সচিব নারায়ন স্বরূপ নিগম নিশ্চয় এই দায় অস্বীকার করতে পারেন না। তাকে সরিয়ে দেওয়ার দাবীও পড়ুয়া করেছিলেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তা মানেন নি।এন এস নিগমের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বিশাল দুর্নীতিচক্র ভাঙা সম্ভব নয়।ততটা সাহসী হয়ত তিনি নন,কিন্তু দুর্নীতিকে জড়িত থাকার ঘটনা যদি তদন্তে প্রকাশিত হয় তাহলে ব্যাক্তিগতভাবে আমি খুবই অবাক হব।

তবে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে এই চার আমলা কি আদৌ কোন শাস্তি পেলেন ? মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন বিনীতকে তার পছন্দমত দপ্তরে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য আমলা বা অফিসারেরা যেখানে যেখানে পোস্টিং পেয়েছেন তা বর্তমান পদের চেয়ে খুব একটা কম গুরুত্বপূর্ণ তা কিন্তু নয়। তাহলে এই অপসারণ কার্যত রুটিন বদলীর চেয়ে বেশী কিছু নয়। মুখ্যমন্ত্রী এভাবেই জুনিয়র ডাক্টারদের ও তার সঙ্গে জনগণের চোখে ধুলা দিয়ে হাততালি নিয়ে বন্যা দেখতে চলে গেছেন।

ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিব পড়ুয়াদের দাবী অনুযায়ী পরিকাঠামো তৈরীর জন্য চিঠি দিয়েছেন।যদিও আগেরদিন মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে ডক্টরদের বৈঠক সত্ত্বেও তারা মিনিটসে সই না করেই নবান্ন ছেড়েছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ শেষে সরকারের যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করল তাতে ডক্টরদের দাবীমত শৌচাগার, অন ডিউটি রুম,সিসি টিভি,মেডিকেল কলেজে নিরাপত্তা সমীক্ষার জন্য

কমিটি,পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী মোতায়েন,বিপদ সংকেত ব্যবস্থা,ডক্টর নার্সসহ শূন্যপদে নিয়োগ ইত্যাদি দাবিগুলি রাখা হয়েছে। যদিও কলেজ সংসদের নির্বাচনসহ কয়েকটি দাবীর প্রতিকার সম্পর্কে কোন নির্দেশ এখনও পর্যন্ত নেই। এই অবস্থায় জুনিয়র ডক্টরদের আংশিক আন্দোলনের সিদ্ধাম্ত নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

কিন্তু যেভাবে হঠাৎ সিবিআই সক্রিয় হয়ে উঠেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে সুপ্রীম কোর্টের নজরদারি বেশ চেপে বসেছে। দ্বিতীয় শুনানিতে ডক্টরদের কর্মবিরতি নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও বিচারপতিরা বরং তাদের নিরাপত্তাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আদালতে বসে সর্বজনসমক্ষে প্রধান বিচারপতি সিবিআই এর দেওয়া রিপোর্টের তথ্যকে শুধু উদ্বেগজনক বলেই থেমে যান নি,বলেছেন তারা বিচলিত। তথ্যপ্রমাণ লোপাটের ধারা তাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। পুলিশ ও প্রশাসনের আচরণ জনমানসে যে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরী করেছে তাতে নানারকম গুজবও ছড়াচ্ছে।এই অবস্থা যেকোন রাজ্যের প্রাশাসনিক প্রধানের পক্ষে উদ্বেগজনক তো বটেই।

কেউ যদি নাগরিকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে নিছক একটা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেন তাহলে একটা বড় ভুল হয়ে যাবে। বিভিন্ন নির্বাচনে দাদাগিরি, সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে না দেওয়া,সরকারি চাকরিতে বিশাল অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ কেলেঙ্কারি,বড় মাপের নেতা থেকে পাড়ার হঠাৎ দাদা হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক তোলাবাজি,বিভিন্ন মন্ত্রীর বাড়ীতে কোটি কোটি টাকাসহ মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার, কয়েক বছরের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবার,ভাই ভাইপোদের বিশাল সম্পত্তি তৈরীর মতো অসংখ্য ঘটনা, সেখানে বিরাট সংখ্যক জনতার বিক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীকে একমিনিটের জন্য সুস্থির হয়ে থাকতে দেবে না তা বলাই বাহুল্য। কিছুদিন আগেও তাকে দেখা গিয়েছিল দুর্নীতি থেকে সরকারের ও দলের পদাধিকারীদের জনতার ক্ষোভ থেকে আড়াল করতে প্রকাশ্যে তাদের ধমক দিয়েছিলেন। কিন্তু আর.জি.করের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে সে সবই ছিল আই ওয়াশ,একটা তৈরী করা চিত্রনাট্য। আজ আর তার অতি বড় সমর্থকও তাকে সততার প্রতীক বলে বিশ্বাস করে না। তিলোত্তমার হত্যার প্রমাণ যেভাবে লোপাটের চেষ্টা হয়েছে তা মুখ্যমন্ত্রীর অগোচরে হয়েছে তা কেউ বিশ্বাস করছেন না। এর ফলে কেউ যে তার উপর সব ভরসা হারিয়েছেন তারই প্রমান রাজ্যজুড়ে এই গণআন্দোলন যা আজ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রসঙ্গ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ

শুভ বসু

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ‘আমার সোনার বাংলা’ থাকবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বাংলাদেশের জামাত এ ইসলামের প্রাক্তন আমির জনাব গোলাম আজম সাহেবের পুত্র যিনি দীর্ঘদিন আয়নাঘরে বন্দি ছিলেন এবং অত্যাচারিত হয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন, তিনি এই প্রশ্ন তুলেছেন। সেই প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতার কথা। এই প্রসঙ্গে আমার একটা পুরোনো লেখা মুখবইয়ের পাতা থেকে নিয়ে এলাম। যাদের ধৈর্য্য আছে তাঁরা পরে দেখবেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত ধারার ঔপনিবেশিক শিক্ষাকে পছন্দ করতেন না। চার দেওয়ালের মধ্যে যে শিক্ষা তা তিনি মনে করতেন শিশু মনকে বন্দি করে রাখে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রসঙ্গে তিনি একেবারেই উৎসাহী ছিলেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে তৈরী ছিল । দীর্ঘ্যদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু পড়ানো হতো না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন ছিল তাঁর সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত কলেজের মাধ্যমে।বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল শুধু ডিগ্রী দানের ক্ষমতা। ১৯০৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উর্ধস্তরে পড়ানো শুরু হয় । ১৯০৬ সালে স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিবৃত রয়েছে নিহার রঞ্জন রায় , প্রতুল গুপ্ত সম্পাদিত Hundred Years of the University of Calcutta A History of the University Issued in Commemoration of the Centenary Celebrations গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশিক শিক্ষার পরিবর্তে এক আধুনিক তপোবনের আদলে বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন বোলপুরে । ২৯ সে ফাল্গুন ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (১৩ মার্চ ১৮৮৮) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ট্রাস্ট ডিড প্রণয়ন করে ঘোষণা করেন বোলপুরে নিরাকার ব্রহ্মর উপাসনা হবে। আর ধর্মভাব প্রসারের জন্যে একটি মেলা হবে। মহর্ষির ইচ্ছানুযায়ী শান্তিনিকেতনে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেন। ১৮৯৯ সালে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ৭ই পৌষ ১৩০৮ বঙ্গাব্দের (২২ ডিসেম্বর

১৯০১) সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র পাঁচ জন ছাত্র নিয়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সূচনা ঘটে। তাঁরা হলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীর চন্দ্র নান, প্রেমকুমার গুপ্ত ও অশোক কুমার গুপ্ত। অনেকে মনে করেন অশোক কুমারের পরিবর্তে গিরীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের মনি ছিল এই বিদ্যালয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো যোগাযোগ ছিল না।

২১ শে জানুয়ারী ১৯১২ সালে ভারতের বড়লাট বাংলা বিভাগ রদ করার ফলে উদ্ভিন্ন মুসলমান মধ্যবিত্তর ক্ষোভে প্রলেপ লাগানোর জন্যে পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। সেই সূত্রে কলকাতায় ও ঢাকায় হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের মধ্যে নানা ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং চাপান উতোর হয়। সেই ঘটনার উল্লেখ করে ২০০০ সালে বাংলাদেশের মেজর জেনারেল (অব) এম এ মতিন, বীরপ্রতীক, আহমদ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা' নামে একটি বইয়ে এই তথ্য জানান যে, দ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চ কলিকাতা গড়ের মাঠে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়।দ তিনি অভিযোগ করেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং মৌলানা ভাসানীর উপর প্রামাণ্য বইয়ের লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা' বই এ লিখেছেন ক্ষ্মশ্রেণীস্বার্থে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন কার্জনের (লর্ড কার্জন) ওপর অতি ক্ষুব্ধ। কার্জনের উচ্চশিক্ষাসংক্রান্ত মন্তব্যের তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় কলকাতার হিন্দু সমাজে। তাতে রবীন্দ্রনাথও অংশগ্রহণ করেন। তিনি যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন,তাতে কিছু ছিল যুক্তি, বেশির ভাগই ছিল আবেগ এবং কিছু ছিল ক্ষোভক্ষ্ম।

আসলে এঁরা কেউই প্রকৃত তথ্যের হিসেবে রাখেন নি। প্রকৃত পক্ষে ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন শিলাইদহে। ১৯ মার্চ ১৯১২ (৬ চৈত্র, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ) ভোরে কলকাতা থেকে সিটি অব প্যারিস জাহাজে রবীন্দ্রনাথের ইংল্যাণ্ড যাবার জন্য কেবিন ভাড়া করা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর ইংল্যান্ড যাত্রা স্থগিত হয়ে যায়।রবীন্দ্রনাথ ২১ মার্চ ১৯১২ তারিখে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখেন- 'আমার কপাল মন্দ ..... নইলে ঠিক জাহাজে ওঠবার মুহূর্তেই মাথা ঘুরে পড়লুম কেন? রোগের প্রথম ধাক্কাটা তো একরকম কেটে গেছে। এখন ডাক্তারের উৎপাতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া নড়াচড়া প্রভৃতি সজীব প্রাণীমাত্রেরই অধিকার আছে, আমার পক্ষে তা একেবারে নিষিদ্ধ।খ'২৪ মার্চ ১৯১২ বিশ্রামের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে রওনা হন। ঠাকুরবাড়ির হিসেবে নিকেশের খাতায় লেখা আছে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র বাবু মহাশয় ও শ্রীমতি বধুমাতাঠাকুরাণী সিলাইদহ গমনের ব্যয় ৩৭৯ নং ভাউচার ১১ চৈত্র ১৫।।৩।. পরদিন সোমবার ২৫ মার্চ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ মৌচাক পত্রিকার সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকারের ভগ্নী কাদম্বিনী দত্তকে এক চিঠিতে লেখেন;এখনো মাথার পরিশ্রম নিষেধ। শিলাইদহে নির্জ্জনে পালাইয়া আসিয়াছি। ১৯১২ সালের ২৮ শে মার্চ রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠি লিখেছেন জগদানন্দ রায়কে। জগদানন্দ রায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক, রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের গৃহশিক্ষক ও শান্তিনিকেতনের শিক্ষক। (তিনি আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রী সুনন্দ ভট্টাচার্য্যের পিতামহ ।) রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে কোনো বক্তব্য প্রকাশ করেন নি। এদিনই তিনি একটি কবিতা লেখেন। কবিতার নাম;' স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি'। এই কবিতাটি গীতিমাল্য কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ৪ সংখ্যক কবিতা। এর পর বাকী ১৫ দিনে শিলাইদহে থেকে রবীন্দ্রনাথ আরও ১৭টি কবিতা বা গান লেখেন। ১২ এপ্রিল, ১৯১২ শিলাইদহ থেকে তিনি কোলকাতায় রওনা হন ।

রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে কোনো কথা উল্লেখ করেন নি। তাঁর সঙ্গে স্যার আশুতোষ বা স্যার সুরেন্দ্রনাথের এ বিষয়ে অন্তত কোনো লিখিত মত বিনিময় হয় নি। রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে ধ্যান জ্ঞান ছিল শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতন নিয়ে কলকাতার বাবু সমাজের অনেকে ঠাট্টা করতেন এবং উপহাস করতেন। শান্তিনিকেতনের খ্যাতি বাড়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ের পর। সেই সময় শান্তিনিকেতনের আশ্রম কথায় রয়েছে ক্ষ্মআশ্রমের পূজনীয় আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে চার দিন এবং কলিকাতা হইতে সম্বর্ধনার জন্যে যে দিবস পাঁচশত গন্যমান্য ব্যক্তি আসিয়াছিলেন , সেই পাঁচদিন বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ ছিল।ক্ষ্ম রবীন্দ্রনাথ এঁদের উপস্থিতিতে খুব খুশি হয়েছিলেন তা নয়। প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' নামক স্মৃতি কথায় বলেন যে রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন 'আপনাদের সম্মানের মদিরা আমি ওষ্ঠে স্পর্শ করলুম কিন্তু অন্তরে গ্রহণ করতে পারলুম না।' কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ১৯১৩ সালের আগে রবীন্দ্রনাথের প্রতি এক প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা ছিল। কাজেই জনাব আবুল মাকসুদ কি করে শ্রেণী চেতনার সমমনস্কতা

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ্য করলেন তাঁর কোনো তথ্য উপাত্ত দেন নি। তিনি বর্তমানে লোকান্তরিত হয়েছেন কাজেই তিনি সেই তথ্য উপাত্ত আর উপস্থাপিত করতে পারবেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। কলকাতার প্রখ্যাত আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষ ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ তার ঢাকা সফর শেষে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করলে ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতামূলক একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর রাজনীতিক স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর আপত্তি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে। শেষ পর্যন্ত স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চারটি নতুন অধ্যাপক পদ সৃষ্টির বিনিময়ে তার বিরোধিতার অবসান করেছিলেন। পরবর্তিতে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগে সহযোগিতা করেন। তার সঙ্গে ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার। কলকাতার মুসলমানদের মধ্যেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে আপত্তি ছিল। মাওলানা আকরাম খান মনে করতেন মুসলমানদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অপেক্ষা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনেক বেশি । আবদুর রসুল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের পক্ষে 'বিলাসিতা' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তৎকালীন মুসলিমদের মতে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, ফলে বাংলার মুসলমানদের বিশেষ কিছু লাভ হবে না। বরং গরীব অথবা যোগ্য মুসলমান ছাত্রদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং দু-একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন ইত্যাদি করলে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্ভব হবে। চব্বিশ পরগণার জেলা মোহামেডান এসোসিয়েশন ১৯১২-র ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করে। (সূত্র হারুন অর রশিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা ও রবীন্দ্রনাথ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পক্রিয়া অনেক আমলাতান্ত্রিক এবং সরকারের নানা কমিশন এর বিবৃত্তির ভিত্তিতে গঠিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় Nathan Commission এর পেশ করা বিবরণীর ভিত্তিতে। মে ২৭ , ১৯১২ সালে নাথান কমিশন তৈরী হয়। . ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর ১মাসে সেই রিপোর্ট গৃহীত হয় . কিন্তু যুদ্ধচলার ফলে সেই রিপোর্ট কার্যকরী করা যায় নি। পরে ভারত সরকার ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে Sadler কমিশন তৈরী করেন যা নাথান কমিশনার রিপোর্টকে গ্রহণ যোগ্য মনে করে। Sadler কমিশন তাঁদের বিবৃতি দেন মার্চ ১৯১৯ সালে . সেই বিবৃত্তির ভিত্তিতে ১৯২১সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁরা মনে করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটু সেকুল্যার প্রতিষ্ঠান হবে তাঁদের আশংকা সত্যি হয়েছিল। উপনিবেশিক আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ হিন্দু ছিলেন। এবং ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সল্ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের তালিকা দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে Sir. P.J. Hartog ০১.১২.১৯২০ to ৩১.১২.১৯২৫ Professor G.H.Langley ০১.০১.১৯২৬ to ৩০.০৬.১৯৩৪Sir. A. F. Rahman ০১.০৭.১৯৩৪ to ৩১.১২.১৯৩৬ Dr. R. C. Majumder ০১.০১.১৯৩৭ to ৩০.০৬.১৯৪২ Dr.Mahmud হাসান ০১.০৭.১৯৪২ to ২১.১০.১৯৪৮

রবীন্দ্রনাথ সেই সময় শান্তিনিকেতনের আশ্রমের হিন্দু রক্ষণশীল সংস্কৃতি কি ভাবে পরিবর্তন করা যায় সে দিকে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নেপাল চন্দ্র রায় কে ভর্তির প্রসঙ্গে রবীন্দনাথ লেখেন 'প্রাচীন তপোবনে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, আধুনিক তপোবনে হিন্দু-মুসলমান একত্রে জল না খায় তবে আমাদের সমস্ত তপস্যাই মিথ্যে।' ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন এবং ঢাকার নবাব খাজা হাবীবুল্লাহ র অতিথি রূপে। পরে তিনি সে সময়ে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদারের অতিথি হন। সেই সময় ঢাকার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্ররা তাঁকে বরন করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেন 'আপনাদের নিকট আমার যে পরিচয় তার কারণ আমি মানুষের সংকীর্ণতার বাহিরে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছি। আমার স্বদেশের জন্যে একটা অভিমান আছে। ভারতের বুকে এতো জাতি , এতো ধর্ম স্থান লাভ করেছে , তার অর্থ আছে। ভারতের হাওয়ায় এমন শক্তি আছে যার বলে সকল সম্প্রদায় এখন আসন লাভ করতে পেরেছে। সকল ধর্ম এখানে স্ফূর্তি লাভ করার একটা সরস ক্ষেত্র পেয়েছে।'

শান্তিনিকেতনেও রবীন্দ্রনাথ পারসী ভাষার চর্চার প্রয়াস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালে পারস্য ভ্রমণ কালে পারস্যের সুলতান কে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সি ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যে এক অধ্যাপক পাঠাতে অনুরোধ করেন। সেই

মতো রেজা শাহর নির্দেশে ইব্রাহিম পুর দাউদ বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। একই সময়ে বিশ্বভারতীতে কিছু দিনের জন্যে ছিলেন হাসান সোহরাওয়ার্দি যিনি ছিলেন ইসলামী শিল্পকলার প্রখ্যাত পন্ডিত। ইব্রাহিমপুর দাউদের তত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের স্বনির্বাচিত ১০০ টি কবিতা শান্তিনিকেতনে ইসলামী ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক মৌলানা জিয়াউদ্দিন অনুবাদ করেন। ১৯৩৫ সালে তা 'সদ্ বন্দে তাগোর' নাম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় তা রবীন্দ্রনাথের সম্মানে আবার প্রকাশিত করে।

আর মৌলানা জিয়াউদ্দিন শান্তিনিকেতনের পথিকৃৎ অধ্যাপক। রবীন্দনাথ তাঁর মৃত্যুতে লেখেন 'তিনি প্রথম আশ্রমে এসেছিলেন বালক বয়সে ছাত্র হিসাবে, তখন হয়তো তিনি ঠিক তেমন করে মিশতে পারেন নি এই আশ্রমিক জীবনের সঙ্গে, যেমন পরিপূর্ণ ভাবে মিশেছিলেন পরবর্তী কালে। কেবল যে আশ্রমের সঙ্গে তাঁর হৃদয় ও কর্মপ্রচেষ্টার সম্পূর্ণ যোগ হয়েছিল তা নয়, তাঁর সমস্ত শক্তি এখানকার আবহাওয়ায় পরিণতি লাভ করেছিল। সকলের তা হয় না। যাঁরা পরিণতির বীজ নিয়ে আসেন তাঁরাই কেবল আলো থেকে হাওয়া থেকে পরিপক্কতা আহরণ করতে পারেন। এই আশ্রমের যা সত্য যা শ্রেষ্ঠ সেটুকু জিয়াউদ্দিন এমনি করেই পেয়েছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতা হল মানবিকতার, আর এই সত্য হল আপনাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করে দেবার শক্তি। ধর্মের দিক থেকে এবং কর্মের দিকে অনেকের সঙ্গেই হয়তো তাঁর মূলগত প্রভেদ ছিল, কিন্তু হৃদয়ের বিচ্ছেদ ছিল না। তাঁর চলে যাওয়ায় বিশ্বভারতীর কর্মক্ষেত্রে যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল, সেটা পূরণ করা যাবে না। আশ্রমের মানবিকতার ক্ষেত্রে তাঁর জায়গায় একটা শূন্যতা চিরকালের জন্যে রয়ে গেল।'

আমাদের দুর্ভাগ্য সেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার নীতিমালা কে সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ আজ চির শান্তিনিকেতনে কিন্তু তাঁর আশ্রমের ছাত্র হিসাবে এবং বাংলাদেশের গুণমুগ্ধ ভক্ত হিসাবে আমার বক্তব্য পেশ করলাম।

Subho Basu. Associate Professor Mcgill University.

নাগরিক স্মৃতিচারণা ঃ এস ওয়াজেদ আলি ও বিশ শতকের উত্তরাধিকার

গৌতম রায়

বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য পরিসরের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব এস ওয়াজেদ আলী হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার জনাইয়ের কাছাকাছি বড় তাজপুর গ্রামে ১৮৯০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াজেদ আলীর পিতা শেখ বেলায়েত আলীর জন্ম ও এই গ্রামে। তাঁর মায়ের নাম ছিল খোদিজা বেগম।

ওয়াজেদ আলীর পিতামহ শেখ জামাতউল্লাহ অষ্টাদশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষিতে ছিলেন এক ব্যতিক্রমী পুরুষ। যে সময় বাঙালি মুসলমানকে ভাগ্যান্বেষণে ভিনদেশ মুখী হতে প্রায় দেখাই যেতো না, সেই সময়ে জামাতউল্লাহ হুগলি থেকে প্রথমে মুর্শিদাবাদ, সেখান থেকে গোয়ালন্দ, আবার সেখান থেকে সুরমা নদীর তীরে শ্রীহট্টে গিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

হুগলির চন্ডীতলার নবাবপুরে ছিল ওয়াজেদ আলীর মামার বাড়ি। তাঁর মাতামহ মুঙ্গের থেকে জায়গীর নিয়ে এসেছিলেন নবাবপুরে। বিয়ে করেছিলেন স্থানীয় বাঙালি পরিবারে। ধর্মীয় বিধিবিধানের পাশাপাশি সমন্বয়ী চেতনাসমৃদ্ধ পারিবারিক পরিবেশে ওয়াজেদ আলীর শৈশব কেটেছিল। ওয়াজেদ আলীর পিতার শৈশবকালে জনাই অঞ্চলের সামাজিক পরিবেশে এতটাই মুসলিম-বিদ্বেষ বলবান ছিল যে, তিনি শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কারণে বড় তাজপুরের পাশে জনাই হাইস্কুলে ভর্তি পর্যন্ত হতে পারেননি সেকালে।

ওয়াজেদ আলীর শিক্ষা শুরু হয়েছিল বড় তাজপুরের পাঠশালাতে। সেই সময়ের গ্রাম্য প্রথা অনুযায়ী মাত্র ৭ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি শিলংয়ে চলে আসেন এবং পিতার তত্ত্বাবধানে শুরু হয় তাঁর আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ। শিলংয়ের মোখার হাইস্কুলে তার ছাত্র জীবনের বুনিয়াদ তৈরি হয়েছিল। সেই স্কুলটি তখন ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। সেখান থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।

উচ্চশিক্ষার জন্য ওয়াজেদ আলী আলীগড় এম এ ও কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে কৃতী ছাত্র হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ১৯০৮ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই এ এবং ১৯১০ সালে ওই

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাস করেন। এটা খুব বিস্ময়ের ব্যাপার যে আলীগড়ের অবাঙালি পরিবেশ, উর্দুভাষীদের আধিপত্য এবং তাঁদের সংস্কৃতির প্রতি পারিপার্শ্বিকতার আকর্ষণ; এই সবকিছুকে অতিক্রম করে, সেই সময় কাল থেকেই বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি এস ওয়াজেদ আলী এক গভীর অনুরাগ নিজের উপলব্ধিতে এনেছিলেন। বাংলা ভাষাকে তিনি তখনো যথেষ্ট দক্ষ নন, এই মানসিক যন্ত্রণা এই সময়কালে তাঁকে যথেষ্ট পীড়িত করতো।

বিএ পাশ করার পরে নিজের গ্রাম বড় তাজপুরে ফিরে এসে, বাংলার গ্রামীণ পরিবেশ, সমন্বয়ী সংস্কৃতির নানা ধারা, বিশেষ করে কীর্তনকে ঘিরে গ্রামীণ সামাজিক পটভূমিকার যে বহিরঙ্গ, তা এস ওয়াজেদ আলী কে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

এরপর তিনি উচ্চশিক্ষার্থে লন্ডনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে বিএ এবং বার-অ্যাট-ল ডিগ্রি পান। লন্ডনপ্রবাসেই তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। এই সময়কালে তিনি গুরুতর ভাবে পিড়ীত হন এবং প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁকে সাহায্য করেছিল ব্রিস্টলের মেয়ে মিস মিলি। তাঁকেই তিনি পরবর্তীকালে বিবাহ করেছিলেন।

১৯১৫ সালে দেশে ফিরে আসার পর তাঁর প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদও ঘটে যায় ওয়াজেদ আলির। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদের প্রসঙ্গে তাঁর বাবার সঙ্গে তাঁর কিছুটা মনান্তর হয়েছিল। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২২ সাল, এই আট বছর আইন ব্যবসায় এস ওয়াজেদ আলী অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন। এই সময় কালেই সাহিত্যিক পরিমন্ডলের সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগ তৈরি হয়।

এই সময়কালে (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে) এস ওয়াজেদ আলী কলকাতা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত হন। এই নতুন চাকরির কালে সাহিত্যকর্মে নিজেকে সম্পুর্ণভাবে সঁপে দিয়েছিলেন ওয়াজেদ আলী। ১৯১৯ সালে 'সবুজপত্রে' তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'অতীতের বোঝা' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে 'ইসলাম দর্শনে' তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'রাজা' প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সংগঠনের সঙ্গে মুজফফর আহমেদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই বছরেই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন এবং অভিভাষণ ও পাঠ করেছিলেন ওয়াজেদ আলি। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯২৬ সালে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করে 'তরুণের কাজ' নামক এক অসামান্য প্রবন্ধ তিনি পাঠ করেছিলেন।

সেই বছর তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন তিনি। ১৯২৭ সালে অবশ্য বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতির পদ থেকে নিজেকে ওয়াজেদ আলি সরিয়ে নেন। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির চতুর্থ অধিবেশন, যেটি অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার বসিরহাটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির পক্ষ থেকে, মূলত মুজফফর আহমেদের প্রচেষ্টায়, কলকাতার আলবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাউসে) কাজী নজরুলের জাতীয় সংবর্ধনার জন্য যে কমিটি তৈরি হয়েছিল, সেই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব এস ওয়াজেদ আলী পালন করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট সম্বর্ধনা সভায় অভিনন্দনপত্রটিও তিনি পাঠ করেছিলেন।

সেই মাসেই আসাম মুসলিম ছাত্র সমিতির সাহিত্যিক সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তিনি যোগদান করেছিলেন। ১৯৩০ সালে নোয়াখালী মুসলিম ইনস্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে তিনি যোগদান করেন এবং একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। ১৯৩২ সাল এস ওয়াজেদ আলী এবং বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে ওয়াজেদ আলী প্রচেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'গুলিস্তাঁ' প্রকাশিত হয়।

এই পত্রিকা প্রকাশ ছিল ওয়াজেদ আলীর জীবনের এক কর্মময় অধ্যায়। 'গুলিস্তাঁ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি সমন্বয়ী চেতনায় বিশ্বাসী, সম্প্রীতির চেতনায় বিশ্বাসী, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে অধিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। পত্রিকাটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী খান বাহাদুর হাশেম আলী খান। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপাত্র 'শিখা'-র মতোই এই 'গুলিস্তা'-র মুখপত্রের প্রচ্ছদে লেখা থাকতো, 'হিন্দু মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত' শব্দবন্ধ।

এই পত্রিকার 'নারী জগৎ' বিভাগ পরিচালনা করতেন অনুরূপা দেবী। অনেকেরই হয়তো জানা নেই, চলচ্চিত্রাভিনেতা ছবি বিশ্বাস এস ওয়াজেদ আলীর 'গুলিস্তা' পত্রিকায় চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিভাগ 'ছায়ার মায়া' পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকে সহযোগিতা করতেন আব্বাসউদ্দিন আহমেদ এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

ঘোষিত ভাবে এই পত্রিকার দর্শন হিসেবে বলা হত বাংলার জয় হোক এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ভিতর দিয়া স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য।

১৯৪৪ সালের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এই পত্রিকার চতুর্থ বার্ষিক উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই সভায় এস ওয়াজেদ আলী বলেছিলেন 'হিন্দু-মুসলমান এই উভয়কে লইয়াই বাঙালি জাতি, বাঙালিকে শক্তিশালী জাতি হিসেবে গড়িতে হইলে বাংলা কৃষ্টির উন্নতি, অর্থনৈতিক উন্নতি, শিল্পের উন্নতি করতে হইলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন চাই। তাহা না হইলে সমগ্রভাবে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দিতে পারে, গুলিস্তাঁ এর ই জন্যে প্রতিষ্ঠিত।' (গুলিস্তাঁ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫১)

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে এই পত্রিকা আয়োজিত সাহিত্য সভায় এ কে ফজলুল হক অংশ নিয়েছিলেন। সেই অধিবেশনে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'যেতে নাহি দিব' এবং প্রবোধ কুমার সান্যাল 'শ্মশান' নামক কবিতা আবৃত্তি করে এক অসাধারণ সম্প্রীতির পরিবেশ রচনা করেছিলেন।

ওয়াজেদ আলীর 'মাশুকের দরবার' গ্রন্থটি প্রকাশ হয় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে (১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে)। এই গ্রন্থেই তাঁর বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' গল্পটি রয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশকালে গ্রন্থটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল ওয়াজেদ আলীর বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লেখা একটি পরিচয় পর্ব। সেখানে এই গল্পটি সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন লিখছেন 'ভারতবর্ষ গল্পটি অভিনব সৃষ্টি! অল্প পরিসরে এক মুদির ছোট্ট কথাটুকু - তাও তার কাজ কারবার লাভ-লোকসান বা সুখ দুঃখ লইয়া নয়। ছোট দোকানে বসে মুদি রামায়ণ পড়ে, নাতি-নাতনিরা শোনে; মুদির ছেলে অদূরে বসিয়া সওদা বেচে - দোকান ঘর খানি খোলার, ঘরে তেলের প্রদীপ জলে। পঁচিশ বৎসর পরে পাড়ার চারদিকে কত পরিবর্তন ঘটে গেল - মাঠ কোঠা ভাঙ্গিয়া প্রাসাদ উঠিল, জলা বস্তীর বুকে পার্ক দেখা দিল, মুদির দোকান কিন্তু তেমনি। বুড়া মুদির মৃত্যু হইয়াছে - তার জায়গায় তার ছেলে আজ সেই রামায়ণ খুলিয়া বসিয়াছে এবং তার নাতি নাতনীকে পড়িয়া শুনাইতেছে শুধু এইটুকু কথা।

এমনি স্বচ্ছ অনাড়ম্বর বর্ণনাভঙ্গী, এমনি ভাবুকতা এই বইয়ের পৃষ্ঠা পূর্ণ! বাংলা ভাষায় বিলাতি সেক্স সমস্যার ধুমধারাক্কা মধ্যে এই বইখানির সরল সহজ ভাষা, তার বিচিত্র ভাব, আর সাজেস্টিভনেস আমাকে একান্ত মুগ্ধ করিয়াছে এবং আমার বিশ্বাস সেক্স তত্ত লইয়া যাঁরা মাথা ঘামাইতে বসেন নাই তারাও এই বইখানির পরিয়া আনন্দ পাইবেন। ভাবিবার অনেক কথায এ বইয়ে আছে। কিন্তু এত কথা বলিবার প্রয়োজন নাই! জোৎস্না কিরণ দেখাইতে প্রদীপ ধরা বাতুলতা।'

এই গল্পের ভেতর দিয়ে এস ওয়াজেদ আলী যেন প্রাচ্যের জীবন-জীবিকার এক সতত প্রতিয়মান অক্ষয় চৈতন্য কে আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন। মানব জীবন ধারা সতত পরিবর্তনশীল তাই এক ধর্ম সেই সতত পরিবর্তনশীল। তাকে অবলম্বনের ভেতর দিয়েই এক চিরন্তনতা বিরাজ করে। সেই চিরন্তনতাকে গ্রহণ করে প্রতিটি জাতি বেঁচে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু কিংবা মুসলমান, প্রত্যেকেরই মানস ভূমিতে বিশ্বাসের একটি মাধুর্য আছে। সেই মাধুর্য এবং লাবণ্য, তাঁদের রোজনামচা কে সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। সময়ের পরিবর্তন হয় ঘড়ির কাঁটা ধরে। সেই কাঁটার তালে তাল রেখে মানুষের প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন হয়। কিন্তু চিত্তের অবলম্বনে যে শাশ্বত বিশ্বাস, তার যে কখনো পরিবর্তন হয় না - এই চিরন্তন ধ্রুবসত্যটি এস ওয়াজেদ আলী যেভাবে দেখিয়ে গেছেন, তা আজও কেবল ভারতবর্ষের মানুষদের জন্যেই নয়, গোটা বিশ্বের মানব সমাজের পক্ষেই সমান সত্য। সভ্যতার অগ্রগতির বিরুদ্ধে একটি শব্দ ও ওয়াজেদ আলী কখনো উচ্চারণ করেন নি। অথচ বিশ্বাসের গহীনে লালিত একটি সাধারণ মানুষের জীবন যাপনকে চরম সত্যের ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তুলে ধরার এই অনুপম ভঙ্গিমা আজও ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক - নানা সমস্যার নিরিখে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছে।

সবধরনের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধেই ওয়াজেদ আলী নিজের জীবন এবং কলমকে পরিচালিত করেছিলেন। ধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে যেমন তিনি সোচ্চার ছিলেন, তেমনি তিনি সোচ্চার ছিলেন দেশপ্রেমের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধেও। অত্যন্ত সোচ্চার ভাষাতেই তিনি বলেছিলেন গোঁড়া ধার্মিক প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক নয়, সে হল ধর্মের একটা বিকৃত প্রতিচ্ছবি। ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারিকেচার। সে রকম ভারতবাসী কিংবা গোঁড়া বাঙালি ও প্রকৃত দেশপ্রেমিক নয়। সে হলো দেশপ্রেমিকের বিকৃত প্রতিকৃতি। এখানেই কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে এস ওয়াজেদ আলীর জীবন দর্শন। বিংশ শতকের প্রথমভাগে, অবিভক্ত ভারতের নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যার ভিতরে দাঁড়িয়ে এস ওয়াজেদ আলী অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ; আমি ভারতবাসী বটে কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ; আমি বাঙালি বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ;' (সাহিত্য জীবনের শিল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ)

তিনি লিখছেন 'এ কথা ভুলবেন না যে আপনি মানুষ, আর সেই হিসেবে মানুষের বিশ্বব্যাপী সভ্যতার উত্তরাধিকারী। যুগের পর যুগ ধরে মানুষ তার জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে

বিরাট, বহুমুখী ব্যাপক এক সভ্যতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। সেই বিচিত্র সৃষ্টি কাব্যে সব জাতিরই দান আছে, সব ধর্মেরই দান আছে, আর সব কৃষ্টিরই দান আছে। তাদের সম্মিলিত প্রেরণা মানবজাতিকে উন্নত জীবনের নিত্যনূতন সন্ধান দিয়েছে। সেই প্রেরণা নির্দেশ যদি আমরা মেনে চলি তাহলে হিন্দু-মুসলমানের প্রগতিশীল জীবনের সন্ধান আমরা পাব, আর আশার উজ্জ্বল আলোক তাহলে আমাদের জীবনযাত্রাকে সুগম আনন্দময় করে তুলবে। তখন স্পষ্টই আমরা বুঝতে পারব যে নিজ নিজ ধর্ম হিসেবে আমরা হিন্দু কিংবা মুসলমান কিংবা খ্রিষ্টান কিংবা নাস্তিক হতে পারে বটে, কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা বিশ্ববাসী, নাগরিক হিসেবে আমরা ভারতবাসী ,আর জাতি হিসেবে বাঙালি। '(বাঙালি না মুসলমান' এই প্রবন্ধটি ভারতবর্ষ পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যা ১৩৫১ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত)

১৯৫১ সালের ১০ই জুন কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলের ঝাউতলার নিজের বাড়িতে এস ওয়াজেদ আলী জীবনাবসান হয়। এই ক্ষণজন্মা, মুক্তচিন্তা অগ্রপথিকের 'ভারতবর্ষ' গল্পটি ছাড়া আর কোনো লেখাই এখন আর সহজলভ্য নয়। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বাংলাদেশের বাংলা একাডেমীর প্রধানের দায়িত্বে থাকাকালীন এস ওয়াজেদ আলীর যাবতীয় রচনাকে একত্রে সংকলিত করেছিলেন।

(ঋণ গুরুচণ্ডালি ১০ জুন ২০২১ ।কিছুটা সংক্ষেপিত)

অন্য চোখে কাশ্মীর

অনিন্দিতা দে

৩

দিল নিথ চোলহম রোসেয়, অলো মায়েনি পোশে মাদনো
ওলাই ভেসি গছভই আবাআস, দুন্যা ছু নেন্দ্রি তা খাআবাস

'কোথায় গেলে ফিরে, আমার হৃদয় উজাড় করে'। কাশ্মীরি মহিলা কবি হবা খাতুনের একটা লাইন মনে পড়ে গেল। তাঁর লেখায় কাশ্মীরের প্রতিটি মানুষের ঘরের দৈনন্দিন জীবনের কথা আর তার টানাপোড়েন যেন নক্সী কাঁথার মত বোনা। কাশ্মীরি ভাষাটা বেশ অন্য রকম। শুনলে মনে হয় কিছু বোঝা যাবে না অথচ একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে সহজেই ধরে ফেলা যায়, কি বলতে চাওয়া হচ্ছে। পাকিস্তানের উর্দু সমৃদ্ধ বুলির সাথে যেন কাশ্মীরির তেমন মিল নেই। যেমন 'পাক'মানে উর্দুতে 'শুদ্ধ' বলে ধরা হয়, কিন্তু কাশ্মীরিতে 'পাক' মানে এগিয়ে যাওয়া। যেমন বাংলায় আমরা পাহাড়ি পথকে 'পাকদন্ডি' বলে থাকি। ওদের বাক্য গঠনও কিন্তু বেশ অন্য রকমের। লোকায়ত এই কাশ্মীরি বোলচাল আমায় খুব আকৃষ্ট করে, হয়তো বাংলা ভাষার সাথে অনেক মিল আছে বলে। যেমন লেপ, কুলুপ, ভাত, এই শব্দগুলো কাশ্মীরিতেও বাবহার হয়। আমি অবসর পেলেই ঘুরে ঘুরে ওদের সাথে ভাব জমাতে আরম্ভ করলাম। ওদের কথা শুনতাম।

প্রায়ে এক মাস হতে চলল আমাদের স্কুল বন্ধ। আমি তাই কিছুদিন হল ডেরা বেঁধেছি ডাল লেকের একটা হাউজ বোটে। সন্ধেটা এদের সাথে সুফি আর হবা খাতুনের গান শুনে কেটে যায়। ওরা নাদ (ইসলামি গান যা শুধু নবি আর আল্লার গুণগান) ছাড়া অন্য কিছু এমনিতে শোনে না, তবে লোকসঙ্গীত বলতে হবা খাতুন আর কিছু কাশ্মীরি গান খুব প্রচলিত। এখানে একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে, কাশ্মীরি মুসলমান বা কাশ্মীরি হিন্দু পন্ডিত; এই দুটো সমুদায়ের সংস্কৃতিতে কিন্তু কোনই অমিল নেই। যেটুকু আছে, সেটা সামাজিক রীতিনীতিতে। রীতি রেওয়াজে। কিছুটা হয়তো অভ্যাসে আছে। কিন্তু তাই বলে যে এরা একেবারে দুই ভিন্ন ধ্রুবের, তা একেবারেই নয়।

এভাবেই দিন কাটছিল। একদিন বুঝতে পারলাম, যে আমার মন ভাল নেই। আসলে শিক্ষিকা তো, ছাত্র না পড়ালে যেন ভাত হজম হয় না। কিন্তু সেই যে ৩৭০ প্রত্যাহার হওয়ার পর থেকে সব বন্ধ, সেই বন্ধই রয়েছে, দিনের পর দিন। কোন অকাল বোধনের অপেক্ষায় কে জানে। এখানে আমাদের স্কুলের মালিকরা থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তাঁরা পেশায় ডাক্তার। উপায় না পেয়ে, একদিন ঠিক করলাম এঁদের প্রস্তাব দেব যে স্কুল যদি না খোলে, অর্থাৎ, ছাত্র-ছাত্রীরা যদি স্কুলে আসতে না পারে তাহলে না হয় আমরাই যাই ওদের ঘরে ঘরে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। রাজিও হলেন তাঁরা। মোট ১২টা সেন্টার খোলা হল গ্রামে গ্রামে। আমি খুব উত্সাহিত হলেও কিন্তু ওখানকার কেউ কোন রকম উত্সাহই দেখাল না। কেউ আসতেও রাজি হল না। আমরা মাত্র পাঁচ জন শুরু করলাম 'স্টাডি সেন্টার' নামে পড়ার ঘর। গ্রামের মৌলবিদের বাড়ি গিয়ে আমরা আর্জি জানালাম, যে কোন পরিত্যক্ত বাড়ি বা মসজিদের কিছু অংশ যদি পাওয়া যায়, যেখানে আমরা তিন থেকে চার ঘণ্টা পড়ুয়াদের পড়াতে পারি, তাহলে খুব ভাল হয়। মৌলবী ও অভিভাবকরা রাজি হলেও সরকারি আমলা ও সেনামহল থেকে অনুমতি মিলল না। যাইহোক, শেষে অনেক বাধা নিষেধ পার করে, বিধি নীতি মেনে আমরা শুরু করলাম পড়ানো। তবে প্রধান শর্ত ছিল, আমার যেন কোন একটা এলাকায়ে বেশিক্ষণ না থাকি।

আমার কাজ করতেই বেশি আনন্দ, তবু একটু সজাগ হয়েই শুরু করলাম স্টাডি সেন্টারের পড়ানোর কাজ। একটা প্রতিশ্রুতি যেন পূর্ণ হচ্ছিল। আর যাই হোক শিক্ষা তো মানুষের মৌলিক অধিকার তার থেকে এদের বঞ্চিত হওয়া অন্তত আমরা আটকাতে পারছি। এমনই এক সকালে পড়াতে গিয়ে দেখি কে বা কারা বিরাট এক তালা ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে সেন্টারে। এটা ছিল কুলগাম মেন বাজারের একটা সেন্টার। এসে দেখি স্কুলের বাচ্চারা বেচারা ভয়ে ঘেমে নেয়ে শুকনো মুখ নিয়ে দাড়িয়ে আছে দরজার সামনে। ওদিকে 'শিন' মানে বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে। শীত আগত প্রায়। বাইরে বেশ ঠান্ডা। আমি জানালা টপকে সেন্টারের ভেতরে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরও ডাকলাম। বললাম একই ভাবে ভেতরে আসতে। সেদিনটা এমনি করেই পড়ানো হোল। যদিও বাকি শিক্ষকদেরও দেখি মুখ শুকনো। বুঝলাম কিছু বলতে চায় সব্বাই। সেই দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যপার বল তো? তোমরা কি কিছু সন্দেহ করছো?' ওরা প্রায়ে এক সাথেই বলে উঠল, ঠিক হচ্ছে না কাজটা। বন্ধ করতে হবে পড়ানো। পরের দিন আবার দেখি দেওয়ালে ফরমান লাগিয়ে দিয়ে গেছে, আমরা যদি পড়ানো বন্ধ না করি তাহলে আমাদের মৃতুর জন্য আমরাই দায়ি থাকব। আমাদের সবার নাম ঠিকানা সহ একটা ফরমান। সবাই মানা করলেও আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল শুধু ভয় দেখানো ছাড়া আর কিছু নেই এটাতে। আমার সন্দেহ হচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল জানতে, কে বা কারা এমন ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। ভাবছিলাম আমার সন্দেহটাই অমূলক না কি ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করাটাই এদের উদ্দেশ্য। এই সুবাদে আমার কাছে একটা আবছা জিনিস ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, কাশ্মীর অশান্ত; এই ভয়টা একটা গোষ্ঠী যেন জিইয়ে রাখতে চায়। ১৯৯০-এর একটা ঘটনা কবে যে কালিমা মেখে হিন্দু-মুসলিম বিরোধিতার চেহারা নিয়েছে আজ আর তার খবর কে রাখে। হয়তো বা এটাই চায় এখানকার বর্তমান রাজনীতি। কিন্তু, ১৯৯০-এর আসল গল্প চুরি গেছে এই উপত্যকায়। আর সে গল্প নতুন করে বলবার দিনও যে আসবে তা জানি।

শেষমেশ বোঝাতে পেরেছিলাম। আমি ও আমার সহকর্মীরা প্রায় আঠারো ঘণ্টা কাজ করতাম রোজ। সেন্টারে লুকিয়ে দু'ঘন্টা পড়িয়ে ফিরে এসে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নোটস তৈরি করা হতো। তারপর তার প্রিন্ট নিয়ে প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সেই নোটস হাতে হাতে মারফত বিলি করার ব্যবস্থা করে আবার পরের দিন একই রুটিনে ফেরা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সেই অনুশীলন সমিতির মতন, এটা একটানা প্রায় পাঁচ মাস চালান, আমদের একটা বড় অভিজ্ঞতা বলতে পারা যায়।

স্বাভাবিক কারণেই এর মধ্যে আমাকে বাসাবদল করতে হয়েছে প্রায়ে তিন বার। শেষটা ছিল খুলবনতালাও বলে একটা গ্রাম। পাকিস্তান সীমান্তের কাছে এই গ্রামে একজন অভিভাবক তাঁর বাড়িতে থাকতে দেন আমাকে। আর ওখানকার একটি মসজিদে আমি তখন পড়াই। না হাদিস বা অন্য কিছুই না। পরাই হিন্দি সাহিত্য, ইংরেজি ব্যাকরণ আর ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস। হাঁটাপথে যেতে হয় সেই মসজিদে। সকাল সাতটা নগদ রওনা হই, কারণ বরফ প্রায়ে চার ফিট মত উঁচু হয়ে জমে থাকে চারিদিকে, রাস্তাটুকুই যা পরিষ্কার। তাপমাত্রা মাইনাস দশ ডিগ্রির কাছে। আস্তে আস্তে হাঁটতাম। হাঁটতে কষ্টই হত। এর মধ্যেই লক্ষ্য করলাম যে তিন চারটে ছেলে আমাকে রোজ দু'গজ দুরত্ব রেখে অনুসরণ করে। একদিন সাহস করে বললাম 'অসলামুবালেকুম ও রেহমাতুল্যা ভাই যান, তু ছেও ঠিক?' ওরা খুব আপন করে জবাব দেয় চিন্তা কোর না। আমরা তো তোমাকে পাহারা দিই। তুমি তো আমাদের ভাল করছো, তোমার নিরাপত্তার দায় তো আমাদের। অবাক লাগে। সেই এক চিন্তাধারা। এতো কিছু করেও আমি আজও এদের আপনজন হয়ে উঠলাম না। একটু যেন কষ্টই হল। বললাম, আমি তো তোমাদেরই একজন। তোমাদের যা হবে, আমারও তাই হবে। ওরা একটু একরোখা একটা জবাব দিল। বলল, 'না না তুমি ভারতীয়, আমাদের জন্য ভাল করার কথা ভাবছ তোমাকে তার জন্য অনেক সুক্রান।'

আমার হতাশা আমায় পেয়ে বসছে বুঝতে পারছিলাম। তবু জিগ্যেস করি, আমার নিরাপত্তার প্রয়োজন কিসের? কে করবে আমার ক্ষতি? একজন হাসতে হাসতে বলে কত এজেন্ট আছে ম্যাডাম কে যে কখন কার জান নিয়ে নেবে এখানে কেউ জানে না, আর তারপর আমরা কাশ্মীরিরা আপনাদের মিডিয়াতে টেররিস্ট হয়ে যাব, ইন্ডিয়াতে সবাই জানবে আমরাই মেরে ফেলেছি আপনাকে। আমি মনে মনে ভাবি, আর একটা গিঁট কি খুলল? আবার জিগ্যেস করলাম, তোমরা কে? 'আমরা মিলিটেন্ট' ছোট্ট জবাব। হাঁটতে হাঁটতে আরো কথা বলি ওদের সাথে। আমার কাছে একটা অদ্ভুত বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়; কাশ্মীরিদের জীবনের ছকে মিলিটেন্ট আর আর্মির ভাষায় মিলিটেন্ট, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। একই মানুষ যেন তার দুই অবতারে উপস্থিত। শুধু একটা দ্বান্দিক তফাৎ। একজন কাশ্মীরি ভাবছে সে রক্ষাকর্তা আর আরেকজন উর্দিধারি ভাবছে সেই রক্ষাকর্তা। আবার দুজনেরই উদ্দেশ্য সামগ্রিক ভাবে এক; কাশ্মীর যেন ভূস্বর্গ থাকে চিরদিন।

সেদিন ফিরে এসে আমার ছাত্রের দাদুর সাথে নুন-চা আর রওউট খেতে খেতে প্রসঙ্গটা তুলি। উনি খুব আগ্রহ নিয়ে

আমাকে বলতে শুরু করলেন, ওঁদের প্রতিবেশী কাশ্মীরি পন্ডিতদের সাথে ছোটবেলার জড়িয়ে থাকা স্মৃতি। ১৯৯০-এর আগের কাশ্মীর ছিল একেবারে আলাদা। তবে তখন দাবি একটাই ছিলো 'আজাদ কাশ্মীর' আর সেই আজাদ কাশ্মীরের স্বপ্ন কিন্তু কাশ্মীরি পন্ডিত আর কাশ্মীরি মুসলমান একসাথে মিলে একভাবেই দেখত। ওঁর কথায় যেটা বুঝতে পারলাম, কাশ্মীর একটা আলাদা মুলুক হয়ে যাক এটা নিশ্চই ওদের চাওয়ার একটা মুল বিষয়, কিন্তু সেটা এরকমটা একদমই নয় যে সেই মুলুককে ভারত থেকে টুকরো করে, আলাদা করে চাওয়া। বরং চাওয়াটা এই রকম যে, কাশ্মীরের যেটুকু ভারতবর্ষে, যেটুকু পাকিস্তানে বা যেটুকু আছে চিনে, তার সবটুকু একসাথে করে একটা 'আপনা মুল্ক'-এর দাবি। এটা একান্তই ওদের চিন্তাধারা, আমার ধ্যানধারনায় আমি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী একটা দেশই দেখতে পাই, তার কারণ আমার শিক্ষা, সমাজ এবং স্বাধীনতা আমায় সেই ভাবেই বড় করে তুলেছে। তাই ওরা আমায় পর ভাবলে আমার কষ্টই হয়। কিন্তু আমি সেকথা আর বললাম না। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে এই 'আপনা মুল্ক' কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার উদাহরণ নয়, শুধুমাত্র একটা নিরাপত্তাহীনতার কারণে, যেটা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সুপ্ত থাকে। বাড়ির বাইরে থাকলে বাড়ির জন্য খুব মন খারাপ করে, বাড়ির তৈরি খাবারের স্বাদ মনে পরে। মনে পরে সেই প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি। ওরা সেই আরাম, সেই শান্তিটুকুই তো খুঁজছে আজ, ওদের 'আপনা মুল্ক'-এ। মনে করছে যেন, এই মুল্ক হলে ওদের বাড়ি ফিরতে পারবে ওরা।

মিলিটেন্ট শব্দটা বাছাই করার পেছনে ওই মানসিকতাই রয়েছে আসলে, যারা সেই 'আপনা মুল্ক' উদ্ধার করার লড়াই লড়ছে তারা ওদের মতে মিলিটেন্ট। আর সেই তারাই সেনা দফতরের খাতায় কলমে হল বিচ্ছিন্নতাবাদী মিলিটেন্ট বা এককথায় টেররিস্ট। আর এরই ফাঁক গলে ঢুকে পড়েছে নোংরা রাজনীতি, কায়েমি স্বার্থের রাজনীতি, ক্ষমতা দখলের রাজনীতি, বিভাজনের রাজনীতি। সেই কালো গহ্বর কখন যে কাকে গ্রাস করে নেবে তা কেউ জানে না। এই পুরো তামাশায়, বহিরাগত আতঙ্কবাদিদের জঘন্য চক্রান্তে ব্যাবহৃত হচ্ছে দুই পক্ষই।

শীতের সন্ধ্যা নেমেছে বিস্তির্ণ উপত্যকা জুড়ে। নিচু কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে যেন সব আনন্দ, যন্ত্রনা, অবিশ্বাস, আস্থা। কে যেন আপন মনে গাইছে হবা খাতুনের সেই লাইনগুলো

'কোথায় গেলে ফিরে, আমার হৃদয় উজাড় করে,
এস আমার আপেল কুসুম সখা, জল'কে চলো,
খানিকপরেই ঘুমাবে উপত্যকা, আসবে বলো?'

দাদু উঠে গেছেন খানিক্ষণ আগেই, তবে তার বলা ওই কথাগুলো আমার কানে যেন হুলের মত বিঁধে আছে। মনে হচ্ছে, গুলিয়ে ফেলছি কি আমি? আমি কে, আমি কেন, আমি কোথায়?

(চলবে)

জম্মু ও কাশ্মীরে ১০ বছর পর বিধানসভা নির্বাচন

শুভ মিত্র

মোদীর ক্ষমতায় আসার বছর অর্থাৎ ২০১৪ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে শেষ বিধানসভা নির্বাচন হয়। পিডিপি বিজেপির সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করে। মুখ্যমন্ত্রী হন মুফতি মহম্মদ সৈয়দ। দুবছরের মধ্যে মুফতি প্রয়াত হন,জানুয়ারি ২০১৬ সালে। কিছুদিন পর মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন মুফতি কণ্যা মেহেবুবা মুফতি। ২০১৮ সালে এই জোট সরকারের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নেয় বিজেপি।জারি হয় গভর্নরস রুল। এরপর বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। দিনটা ছিল ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ সাল। অন্যান্য দলগুলি বার বার একযোগে সরকার গঠনের দাবী জানালেও কেন্দ্রীয় সরকার তা নাকচ করে দেয় বিশেষ উদ্দেশ্যে তা হল যাতে রাজ্য বিধানসভা, রাজ্য ভেঙে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার বিরুদ্ধচারণ করতে না পারে।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে মোদী সরকার সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে এবং জম্মু কাশ্মীর রি- অর্গানাইজেশন আইন পাস করায়। জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখকে দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসাবে গণ্য করা হয়। করোনার লকডাউনের ঠিক আগে ডি- লিমিটেশন কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয় ২০২২ সালের মে মাসে। জম্মু ডিভিশনে অতিরিক্ত ৬ টি আসনসহ ৪৩ টি আসন এই ডিভিশনে, কাশ্মীর ডিভিশনে ৪৭ টি আসন এবং ২৪ টি আসন পাক অধিকৃত অঞ্চলে নির্ধারিত হয়।মোট ১১৪ টি আসন। এরপর সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে সেপ্টেম্বর মাসে ভোটের দিন ঠিক করা হয়।দেশের ইতিহাসে এই প্রথম একটা রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে ও সেখানকার মানুষের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করে নির্বাচন হচ্ছে।প্রথম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল গত ১৮ তারিখে,২৪ টি আসনে। ভোট পড়ল ৬১ শতাংশেরও বেশী। ক'বছর ধরে জঙ্গী হানা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে আইন শৃঙ্খলার অবনতির ফলে জনসাধারণ চরম বিরক্ত। প্রথম দফার নির্বাচনে তাই জনগণ বেশ ভালো সংখ্যায় ভোট দিয়েছেন।

এই নির্বাচনে কংগ্রেস, ন্যাশনাল কনফারেন্স , সিপিআই (এম)ও প্যান্থার পার্টির আসন সমঝোতা হয়েছে। বিজেপি ও মেহবুবা মুফতির পিডিপি একক ভাবে লড়ছে।

বারমুলা থেকে নির্বাচিত এম.পি ইঞ্জিনিয়ার রশিদ তাঁর

দল আওয়ামী ইত্তেহাদের সঙ্গে জামায়াত ইসলামীর জোটকে সময়ের দাবি বলেছেন। তিনি নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছেন। সম্প্রতি তিহার জেল থেকে অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্তি পেয়েছেন রশিদ।

ইঞ্জিনিয়ার রশিদ নামে পরিচিত শেখ আবদুল রশিদ জম্মু ও কাশ্মীর নির্বাচনের জন্য নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সদস্যদের সাথে তার আওয়ামী ইত্তেহাদ পার্টির (এআইপি) জোটকে 'সময়ের প্রয়োজন' বলে অভিহিত করেছেন।ইন্ডিয়া টুডে টিভির সাথে কথা বলার সময়, বারামুল্লার স্বতন্ত্র সাংসদ বলেছেন যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জামায়াতে ইসলামী অংশগ্রহণকে স্বাগত জানানো উচিত। রশিদ বলেন, 'তাদের (জামায়াত) সাথে আমার অনেক মতপার্থক্য আছে, কিন্তু আমরা একটি বিষয়ে একমত যে কাশ্মীরিদের একটি গতিশীল নেতৃত্বের প্রয়োজন যা শান্তিপূর্ণ কাশ্মীরের জন্য কাজ করবে,' ।বিজেপির আশা রশিদ, কংগ্রেস -- এন.সি.পি. জোটের ভোটে ভাগ বসাবে

বিরোধীরা যেখানে শক্তিশালী সেখানে তাদের ভোট ভাগ করার জন্য বহু নির্দল প্রার্থীকে কর্পোরেটদের অর্থের বলে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি।

ভারতের বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা

সৌর বসু

নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি ইউক্রেন সফরে গিয়েছিলেন।

নরেন্দ্র মোদির ভক্তবৃন্দ এবং ভারত সরকার এই সফরকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদির সাফল্য বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষে জি-টোয়েন্টি সম্মেলনের সময়ও গদি মিডিয়া নরেন্দ্র মোদিকে বিশ্ব গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন। জি-টোয়েন্টি সম্মেলন নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জি-টোয়েন্টি সম্মেলন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় এবং সভাপতি র পদটি কোন স্থায়ী পদ নয়। জি-টোয়েন্টি সম্মেলনে সভাপতির পদ অলংকৃত করার মধ্যে মোদিজীর কোন কৃতিত্ব নেই। তৎসত্ত্বেও তাঁর ভক্তবৃন্দ, তাঁর বশংবদ ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম মোদিজিকে বিশ্বগুরু অভিধায় ভূষিত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। নরেন্দ্র মোদি জুলাই মাসে রাশিয়া সফরের পরে , আগস্ট মাসে ইউক্রেনে যান।

রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে শান্তিস্থাপন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যেই তার ইউক্রেন সফর বলে ভারতীয় কূটনীতিক মহল ঘোষণা করে। মোদীজী ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিরর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জেলেনস্কি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন নরেন্দ্র মোদির প্রস্তাব তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বিষয়ে জেলেনস্কি সাংবাদিকদের বলেন নরেন্দ্র মোদী ব্লাডি ক্রিমিনাল কে আলিঙ্গন করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলন যখন হচ্ছে তখনও নরেন্দ্র মোদি ইউক্রেন এর সীমানা ত্যাগ করেন নি। এ ধরনের সাংবাদিক সম্মেলন একজন দেশ নেতার পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক। এ বিষয়ে করণ থাপার, ভারতের প্রাক্তন বিদেশ সচিব এবং রাশিয়া ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত Kanwal Sibal এর অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন জেলেনস্কির এই আচরণ অত্যন্ত বালখিল্য, অভব্য এবং অন্তঃসারশূন্য। প্রকৃতপক্ষে জেলেনস্কি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। নরেন্দ্র মোদি স্বতপ্রণোদিতভাবে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের এর মধ্যে সন্ধিস্থাপনের গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন নিজেকে বিশ্ব গুরু প্রতিপন্ন করার আশায়।কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে যে পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ জেলেনস্কির মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট।

নরেন্দ্র মোদি ইউক্রেন ভ্রমণের পূর্বে জুলাই মাসে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন। তিনি যখন রাশিয়ায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করছেন, তখন একটি ক্ষেপণাস্ত্র ইউক্রেনের হাসপাতালের এসে পড়ে এবং ৩৭ জন শিশুর মৃত্যু ঘটে। ক্ষেপণাস্ত্রটি রাশিয়া নিক্ষেপ করেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এছাড়াও তখন ওয়াশিংটনে, ন্যাটো র (নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন) ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ন্যাটো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির একটি সংগঠন যা গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে।

ইউক্রেনের জন্ম হয় ১৯৯১ সালের সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর।ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার সীমান্ত দখলদারি নিয়ে বিবাদ। এই বিবাদের খুঁটি নাটি এখানে আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু এই বিবাদে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছে ন্যাটোর সদস্য ভুক্ত দেশগুলো। তারা ইউক্রেনকে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য অস্ত্র সরবরাহ করছে। রাশিয়া এবং চীন দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাংলাদেশ শ্রীলংকা ভিয়েতনাম প্রভৃতি রাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে। আমেরিকা চাইছে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাজার দখল করতে । সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া এবং চীন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেন কে কৌশলগত কারণে মদত দিচ্ছে আমেরিকা সহ পুঁজিবাদী দেশগুলি।

ওয়াশিংটনে ন্যাটোর ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে, একই সময়ে রাশিয়াতে পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করার কারণে ওয়াশিংটন ভারতের তীব্র সমালোচনা করে। পুতিনের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ ছবি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।। আমেরিকা ছাড়াও অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ভারতের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে।

আমেরিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট ভারতের আচরণে আশাহত হন। ইতিপূর্বে জুন মাসে সুইজারল্যান্ডে শান্তি সম্মেলনে ভারত থেকে কয়েকজন প্রতিনিধিকে পাঠানো হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাবে ভারত সই করতে রাজি হয়নি ,কারণ সম্মেলনে রাশিয়া অনুপস্থিত ছিল। ভারত বরাবরই রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের কথা বলে আসছে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, সংবাদমাধ্যমে, ভারতের প্রস্তাবের কথা প্রচারিত হয়েছে। যদিও ভারত বিগত দু-তিন বছরে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে ইউক্রেনে পৌঁছতে পারেনি।

বাস্তব পরিস্থিত হল এই, যে, ভারত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করছে। আমেরিকা নরেন্দ্র মোদির সম্প্রতিক রাশিয়া ভ্রমণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ।

আমেরিকা কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নরেন্দ্র মোদির ইউক্রেন সফর। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদির ব্যর্থতা। প্রশ্ন উঠেছে দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদির উজ্জ্বল ভাবমূর্তি কি ক্রমশ অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ছে।

নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টি সাম্প্রতিক নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। ভারতের অর্থনীতির বেহাল অবস্থা। অর্থনৈতিক বৈষম্য দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মহীনতা এবং মুদ্রাস্ফীতি ভারতের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। মোদিজীর ভক্তবৃন্দের আকাঙ্ক্ষা মোদীজি কে বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করার।

একদিকে ভারতের অভ্যন্তরে যখন এই অর্থনৈতিক দুরাবস্থা অন্যদিকে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের অবদান রয়েছে, কিন্তু তা সত্বেও বাংলাদেশ ভারতবর্ষের উপর বীতশ্রদ্ধ। নেপালের সঙ্গেও ভারতবর্ষের সম্পর্ক সহজ নয়। নেপাল মনে করে ভারতবর্ষ তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলায়। পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর ভারতের এই দাদাগিরির কারণে তারা ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদীর ভক্তবৃন্দের ভারতকে বিশ্ব গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা অলীক কল্পনা মাত্র।ভারতে ৫ই

জাতীয় শিক্ষক দিবসের আলোকে বাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি

মজিবুর রহমান

সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৬২ সাল থেকে এই কর্মসূচি পালিত হয়ে আসছে। ওই বছর ১৩ই মে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (৫.৯.১৮৮৮ - ১৭.৪.১৯৭৫) ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হন। রাধাকৃষ্ণণ মূল প্রবাহের স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না। কিন্তু অধ্যাপক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁর একটা আন্তর্জাতিক পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যানচেস্টার কলেজ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা ছাড়াও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শনের উপর বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রজ্ঞার স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার ১৯৩১ সালে তাঁকে নাইটহুড প্রদান করে। অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাধাকৃষ্ণণের পাণ্ডিত্যের প্রতি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর (১৪.১১.১৮৮৯-২৭.৫.১৯৬৪) গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। নেহরু রাধাকৃষ্ণণকে রাষ্ট্র গঠনের কাজে ব্যবহার করার কথা গুরুত্ব সহকারে ভাবতে শুরু করেন। রাধাকৃষ্ণণকে ১৯৪৬ সালে গণপরিষদ বা সংবিধান সভার সদস্য নির্বাচন করা হয়। ১৯৪৮ সালে তাঁর সভাপতিত্বে গঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন। ১৯৪৯ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে দেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি মনোনীত হন। ১৯৫৪ সালে ভারতরত্ন পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। ওই বছর স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা ভারতের শেষ গভর্নর-জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (১৮৭৮-১৯৭২) ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামণের (১৮৮৮-১৯৭০) সঙ্গে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা অর্জন করেন। ১৯৬২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে তাঁর গুণমুগ্ধ প্রাক্তন পড়ুয়ারা তাঁর জন্মদিন উদযাপন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁর জন্মদিন নিছক আনন্দ উৎসব করে কাটিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে দিনটিতে শিক্ষকদের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হলে তিনি অধিক খুশি হবেন বলে জানান। ভারত সরকার তাঁর জন্মদিন জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতিবছর ৫ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষককে পদক ও অর্থ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এখন অনেক রাজ্য সরকারও আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষকদের সম্মানিত করে। বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানও বিশিষ্ট শিক্ষকদের

সংবর্ধনা দেয়।

প্রতিভা, পরিশ্রম ও প্রত্যয় থাকলে যে যেকোনও প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায় তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। তাঁর জন্ম হয়েছিল তামিলনাড়ুর একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। পরিবার চেয়েছিল সামান্য লেখাপড়া শিখে তিনি মন্দিরের পূজারি হোন। যে দু'পয়সা উপার্জন হবে তাই দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে যাবে।মাত্র ষোলো বছর বয়সে, ১৯০৪ সালে, তাঁর বিয়েও দিয়ে দেওয়া হয়। পারিবারিক ও সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে খুব প্রতিবাদী না হয়েও মেধাবী রাধাকৃষ্ণণ মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি সবসময়ই ক্লাসে প্রথম হতেন এবং নিয়মিত বৃত্তি পেতেন যা থেকে তাঁর লেখাপড়ার খরচ অনেকটাই উঠে আসত। কিন্তু এতকিছুর পরও স্কুল জীবন শেষ করে কলেজে কোন্ বিষয় নিয়ে পড়বেন তা স্থির করা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত এক তুতো ভাইয়ের কাছ থেকে তিনি দর্শনের কিছু বইপত্র পান এবং ওই বিষয় নিয়েই কলেজে ভর্তি হন। অসাধারণ রেজাল্ট করেন এবং ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য একটি বৃত্তি পান। তাঁর অধ্যাপক ও শুভানুধ্যায়ীদের অনেকেই তাঁকে ক্যারিয়ার গঠনের স্বার্থে স্কলারশিপ নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী গমনের পরামর্শ দেন। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে তিনি সেই 'সুবর্ণ' সুযোগ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তখন তিনি বলেছিলেন, ইংল্যান্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে নয় পড়াতে যাব। আমরা সবাই জানি, তাঁর বুলি বৃথা যায়নি। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর সময়কালে তাঁর মতো আর কোনো ভারতীয়কে একজন দার্শনিক তথা শিক্ষাবিদ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও স্বীকৃতি পেতে দেখা যায়নি।

শিক্ষক দিবস সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে স্মরণ করার পাশাপাশি শিক্ষক সমাজ ও সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনারও দাবি রাখে। পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সদর্থক আলোচনার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন ধরেই একটা ভয়ঙ্কর অবনমন চলছে। এক সময় শিক্ষকরা সমাজে সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অন্য অনেক পেশায় অর্থ অথবা ক্ষমতার প্রাচুর্য থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্মান ও সম্ভ্রম পাওয়ার দিক থেকে শিক্ষকরা এগিয়ে ছিলেন। তাঁদের পোশাক আশাক, কথা বার্তা, চলন ফেরন সহ সামগ্রিক জীবনযাপন সাধারণ মানুষ অনুকরণ করত।শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিকাঠামোগত অভাব থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ সফলভাবে সম্পন্ন হত। তাঁরা তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে শ্রেণীকক্ষের পাঠদানকে ফলপ্রসূ করে তুলতেন। বাড়ি ও বিদ্যালয়ের পড়াশোনা পড়ুয়াদের বিষয়বস্তুর গভীরে নিয়ে যেত। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল চমৎকার। শিক্ষকদের প্রতি অভিভাবকদেরও অগাধ আস্থা ও ভরসা ছিল। অভিভাবকরা সন্তানদের 'মানুষ' করার দায়িত্ব শিক্ষকদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন।তাই শিক্ষকরা মানুষ তথা সমাজ গড়ার কারিগর হিসেবে অভিহিত হতেন। দুঃখজনকভাবে শিক্ষকদের সম্পর্কে এমন মর্যাদাসূচক অভিধা আজ অবলুপ্তির পথে। শিক্ষকরা ভীষণ সমালোচনার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। রাস্তাঘাটে, চায়ের দোকানে সবাই তাঁদের নিন্দে মন্দ করছে। তাঁরা 'শ্রেণী শত্রু' হয়ে উঠছেন। শিক্ষকদের এহেন অবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি দুশ্চিন্তার বিষয়। শিক্ষকদের ওপর শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যে অবস্থানকারী ছেলেমেয়েদের সঠিক পথ দেখানোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি বর্তায়। অন্য কোনো পেশার মানুষ ওই কাজ করার জন্য নিয়োজিত হন না। সেই অবকাশও তাঁদের থাকে না।শিক্ষক সমাজের সাহায্য ছাড়া দেশে সুনাগরিক তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষক সমাজের মর্যাদা ও গুরুত্ব হ্রাস অথবা নষ্ট করে কোনো জাতির সুষ্ঠু স্বাভাবিক সমৃদ্ধি হতে পারে না। সেজন্য সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার হার বাড়লেও মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিকের সংখ্যা কিন্তু সেভাবে বাড়তে দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে নিশ্চিতভাবেই একাধিক কারণ রয়েছে। রাষ্ট্র, সমাজ, সরকার অনেকেই দায়ী। শিক্ষকরা নিজেরাও তাঁদের দায় অস্বীকার করতে পারেন না। তাঁদের আত্মসমালোচনা করতে হবে এবং হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। পরিকাঠামোগত অথবা প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা থাকলেও শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যাতে কোনো খামতি না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। সম্প্রতি শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতাহাতি বা চুলোচুলিতে জড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে যা কোনভাবেই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। বিদ্যালয়ে এসে পঠনপাঠন ও তৎসম্পর্কিত জরুরি কাজের বাইরে ক্ষুদ্র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কূটকচালি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই এমন অ-শিক্ষকসুলভ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। স্টাফ রুমের পরিবেশ শান্ত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হতে হবে। সহকর্মীদের সহমর্মিতাবোধ বাড়াতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে এখন এক ভয়াবহ অবস্থা চলতে দেখা যাচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোনো স্তরেই শিক্ষকরা আজ আর নিরাপদ নন। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেই তাঁরা অভিভাবক ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের হাতে শারীরিক ভাবে আক্রান্ত ও নিগৃহীত হচ্ছেন। সরকার বা প্রশাসন কোনো সদর্থক পদক্ষেপ করছে না বরং নেতা মন্ত্রীরা প্ররোচনামূলক মন্তব্য করছেন। দোষীরা শাস্তি পাচ্ছে না। এর ফলে শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনা বাড়ছে। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকদের ওপর চড়াও হচ্ছে। শিক্ষকের

যদি শিক্ষার্থীকে মৃদু প্রহার করা বা বকুনি দেওয়ার অধিকার না থাকে তবে পঠনপাঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার জন্য শাসন করা অত্যন্ত জরুরি। শাসন না থাকলে শিক্ষার্থীরা বিশৃঙ্খল ও বেয়াদব হবে, সুনাগরিক হবে না। 'স্পেয়ার দ্য রড অ্যান্ড স্পয়েল দ্য চাইল্ড' প্রবাদটি আজও প্রাসঙ্গিক। পড়ুয়াদের প্রতি শিক্ষকদের আচরণ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন না করে শিক্ষকদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করার ছাড়পত্র দেওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি শিক্ষকদের মর্যাদাহানির একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন শিক্ষকদের এখন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এটা তাঁদের জন্য খুবই অস্বস্তিকর ও অপমানজনক ব্যাপার। যাঁরা নিয়োগপত্র পেতে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা দরকার কিন্তু যোগ্য ও অযোগ্য সকলকেই একই তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিতর্ক ও মামলার নিস্পত্তি না হওয়ার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম ডামাডোল চলছে। শিক্ষকের অভাবে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে ভালভাবে পঠনপাঠন চালানো সম্ভব হচ্ছে না।জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে। এজন্য সরকারি বিদ্যালয় ছেড়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির হার হু হু করে বাড়ছে।অধিকাংশ স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের দৈনিক উপস্থিতি পঞ্চাশ শতাংশের কম। মধ্যাহ্নকালীন আহার ও বিভিন্ন ইনসেনটিভ দিয়েও পড়ুয়াদের বিদ্যালয়মুখী করা যাচ্ছে না।প্রায় প্রতিটি ক্লাসে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা অনেকটাই বেশি যার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যাতেও। ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ভালো কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া কি দুশ্চিন্তার বিষয় নয়? এখনও তো এরাজ্যে নারীর থেকে পুরুষের সংখ্যা বেশি। আসলে লেখাপড়া শিখে ডিগ্রি অর্জন করেও চাকরিবাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে ছেলেরা শিক্ষাঙ্গনে থাকতে চাইছে না। সংসারের হাল ধরার জন্য পড়াশোনাকে বিদায় জানিয়ে কম বয়সেই কায়িক শ্রমের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। মেয়েরা যেহেতু 'বিদেশ খাটতে যায় না' তাই তারা বাড়িতেই থাকে। কিন্তু তারা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে আর নিয়মিত স্কুলে যায়, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তাদের অধিকাংশই স্কুলে ভর্তি হয়ে থাকে কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্পের টাকা পাওয়ার জন্য। কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, ট্যাব ও অন্যান্য স্কলারশিপ থেকে তাদের 'উপার্জন' মন্দ নয়! কন্যাশ্রী প্রকল্প প্রবর্তনের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল নাবালিকা বিবাহ বন্ধ করা।বলাই বাহুল্য, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। 'কে টু' প্রাপকদের অর্ধেকেরও বেশি বিবাহিতা। তারা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, সন্তান কোলে অথবা স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে স্কুল আসে কে টু ফর্মের খবর নিতে। লজ্জা শরমের বালাই নেই।সততা, সত্যবাদিতার শিক্ষার পরিবর্তে বিদ্যালয়ে মিথ্যাচার, চিটিংবাজির ট্রেনিং চলছে। কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য ঘুষ দেওয়া নেওয়া শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক আর জি কর-কাণ্ডেও ডাক্তারি শিক্ষায় দুর্নীতির খবর প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এমন পচন চলতে থাকলে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সমূহ বিপদ। যে শিক্ষার আলোক প্রজ্জ্বলন করার কথা সেখানে এতো অন্ধকার থাকলে মহা মুশকিল।

শিক্ষক দিবসকে একটি নিছক বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত করলে ভুল হবে।এর তাৎপর্যকে বছরভর জাগরূক রাখতে হবে।সুশিক্ষা ব্যক্তিগত জীবনে ও বৃহত্তর সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। উল্টোদিকে কুশিক্ষা ধ্বংস ও পতনের কারণ হতে পারে।এখন বোধহয় দ্বিতীয়টি বেশি ক্রিয়াশীল ও সক্রিয়। শিক্ষক দিবসে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শিক্ষক সহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল শিক্ষিত মানুষকে অঙ্গীকারবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

লেখকঃ কাবিলপুর হাইস্কুল, মুর্শিদাবাদের প্রধান শিক্ষক।

গ্রেপ্তার হলেন শাহরিয়ার কবীর! পথের দখল নিয়েছে ৭১ এর ঘাতক ও দালালরা ঃ কোথায় চলেছ তুমি, বাংলাদেশ?

মনিরুল হক

মহম্মদ ইউনুস পরিচালিত বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হলেন সে দেশের প্রখ্যাত লেখক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা, মানবাধিকার রক্ষায় অগ্রণী যোদ্ধা, 'একাত্তর ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি'র প্রাক্তন সম্পাদক ও সভাপতি এবং বর্তমানে ওই সংস্থার অন্যতম উপদেষ্টা, সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ নাগরিক শাহরিয়ার কবীর। অনেকদিন ধরেই তিনি শারীরিক ভাবে অসুস্থ। ঘরেই থাকেন। চলাফেরা করতে সাহায্য নিতে হয় হুইল চেয়ারের। সেই তাঁকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে গনহত্যা এবং আরও কিছু অভিযোগের অজুহাতে!

গত ৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পর এখনও পর্যন্ত অরাজকতার মধ্য দিয়েই চলছে বাংলাদেশ। শাসন ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। এতদিন ধরে বিরোধী আওয়ামী লিগ দলের হাজার হাজার কর্মী, সমর্থক ও নেতাকে হয় খুন করা হয়েছে না হয় জেলে ভরা হয়েছে। তাঁদের হাজার হাজার বাড়িঘর, অফিস, ব্যবসায়িক ক্ষেত্র, বড় বড় কারখানা, স্থাপনা লুট করা

হয়েছে তারপর সেসব জায়গায় আগুন লাগান হয়েছে। রেহাই পায়নি সাধারণ মানুষও। অন্যদিকে সরকারের সমর্থক দল বি এন পি, জামাত ইসলামী, অন্যান্য ইসলামী গ্রুপ, জুলাই আন্দোলনের 'সমন্বয়ক' গ্রুপ প্রভৃতি গোষ্ঠী নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ও এলাকা দখলের অভিপ্রায়ে পরস্পরের মধ্যে খুন-জখমের রাজনীতিতে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু এইসব বিরোধ থাকলেও একটি ব্যাপারে ইউনুস অনুগামীরা এককাট্টা। বিষয়টি হল আগামীদিনে বাংলাদেশে সর্বাংশে ইসলামিক আদর্শের এক সংবিধান তৈরি করা এবং ইসলামিক অনুশাসনে দেশ শাসন করা। আর এর জন্য প্রথমেই যে কাজটা করা দরকার তা হল বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানকে বাতিল করা, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধকে হেয় প্রতিপন্ন করা, পারলে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে চিরতরে মুছে ফেলা। এই কাজটি তাঁরা সুচারু ভাবেই সম্পাদন করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁরা জানেন যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যতদিন বাঙালিদের মনে জাগরুক থাকবে ততদিন বাংলাদেশকে ইসলামিক মৌলবাদী দেশে রূপান্তরিত করা যাবে না। তাই তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুছে ফেলার জন্য সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করেছে।

মনে রাখতে হবে জামাতে ইসলামি কখনই পাকিস্তান ভাগ চায় নি, স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নেয় নি। সর্বধর্মের সমন্বয়ে এক ধর্মনিরপেক্ষ, গনতান্ত্রিক বাংলাদেশ যাতে গড়ে না ওঠে সে জন্য তাঁরা খুনে বাহিনী গঠন করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে একযোগে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লাড়াই করেছিলেন। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সেই জামাতে ইসলামি আজ বাংলাদেশের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা তাদের থেকেও বেশি সঙ্কীর্ণ, আরও বেশি মৌলবাদী,আরও বেশি নিষ্ঠুর সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করছে, সবাইকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসছে। জামাতে ইসলামী চাইছে বর্তমানের অগণতান্ত্রিক, অনির্বাচিত এন.জি.ও অধ্যুষিত উপদেষ্টারা পুতুল-পুতুল সরকারটি নিয়ে খেলায় ব্যস্ত থাকুক এবং সেই অবসরে তাঁরা নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী দেশে শাসন- অনুশাসনের ব্যাপারটি দেখাশোনা করুন। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। আর বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই ব্যবস্থায় কেউ যদি বেগড়বাই করেন তো তিনি ফলও পাবেন হাতেনাতে। এই রকমই এক কর্মফল উপভোগ করলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা (র‍্যাঙ্ক কি ২ নম্বর ছিল?) শাখাওয়াত সাহেব। তিনি বাধালেন স্নাইপার রাইফেলের গুলি নিয়ে। বললেন, এই ধরনের গুলি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করে না। কিন্তু জুলাই সংঘগোলর্ষে এই গুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইঙ্গিত যাচ্ছিল আন্দোলনকারীদের দিকে। ব্যাস্, তাকে মুড়ে ফেলা হল পাট-চটের বস্তায়!

জিন্না বন্দনা ঃ

ঠিক যে সময়কালে ভারতে মোদিবাবু গোমাতা-গোবৎস নিয়ে আদিখ্যেতা করে সময় কাটাচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে বাংলাদেশের উপদেষ্টারা ব্যস্ত জিন্না বন্দনায়। ঢাকা প্রেস ক্লাব ছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম পীঠস্থান। পাকবাহিনী তাই এই প্রেসক্লাবকে অভিবাদন জানিয়েছিল গুলি-গোলা বর্ষণ করে। বহু সাংবাদিক বীরবিক্রমে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, পাকিস্তান শাহীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। বিনিময়ে পেয়েছিলেন মৃত্যুর শীতলতা। এখন একদিকে সেই প্রেস ক্লাবের নির্বাচিত সম্পাদক শ্যামল দত্তকে গ্রেফতার করা হচ্ছে আর অন্যদিকে সেই প্রেসক্লাবে 'উপদেষ্টা'রা আলো ছড়িয়ে মহা সমারোহে উদযাপন করছেন, দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা সাভারকরের সঙ্গী পাকিস্তানের জনক মহম্মদ আলি জিন্নাহর মৃত্যুবার্ষিকী। ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রক্তে হোলি খেলেছিল পাক বাহিনী। সেখানেই বাংলাদেশের পতাকার সাথে পাকিস্তানের পতাকাকে পাশাপাশি প্রদর্শন করে উদযাপন করা হচ্ছে প্রেমপর্ব। যেন বহুযুগ পরে আবার মিলে গেল দুই ভূখন্ড! যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী , তাদের উত্তরসূরিরা গত ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদিন পালন করতে দেয়নি, তারাই এখন জিন্নার মৃত্যুদিন পালন করছে। তারা এবং ঢাকায় পাক উপ - রাষ্ট্রদূত কামরান ধাঙ্গাল ওইদিন তাদের বক্তৃতায় বলেছেন বঙ্গবন্ধু নয় , মহম্মদ আলি জিন্নাই হচ্ছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপিতা।

দেশদ্রোহী আমান আযামীকে দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের প্রস্তাব যখন সাধারণ মানুষ প্রত্যাখ্যান করলেন তখন বলা হল উনি জামাতে ইসলামের কেউ নন। কিন্তু এই পৃথিবীর সবাই জানেন যে আযামী সাহেব জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আযমের পুত্র এবং একই সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধবাদী। ঢাকায় আয়েশ করা উপদেষ্টা পরিষদ এবং দেশের শহর-গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা তাঁদের বাহিনী মনে করছেন, আওয়ামী লিগকে প্রায় শেষ করে আনা গিয়েছে। এখন ঠিক পাক বাহিনীর মতো তাঁদের চোখ পড়েছে মুক্তিকামী, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, মুক্তমনা সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি।তাই শাহরিয়ার কবীরের গ্রেপ্তার র‍্যান্ডম অনাচারের একটা উদাহরণ, এটা ভাবা ভুল হবে। এই গ্রেপ্তার এক সুচিন্তিত পরিকল্পনার অঙ্গ।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আক্রান্ত ঃ

বাংলাদেশের ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণে জন্ম হয় 'ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি'র। ১৯৭৫ সালে মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের পর বাংলাদেশ হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের

চেতনা বিরোধী, সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। তাদের আস্ফালন দিনে দিনে বেড়েই চলল। রাজাকার, আলবদর প্রভৃতি বাহিনীর লোকজন নতুন করে সংগঠিত হতে শুরু করল। গোলাম আজমের মত মানুষ, মুজিব সরকার যাঁদের নাগরিকত্ব বাতিল করেছিলেন, সেই তিনি জিয়াউর রহমানের সময় পাকিস্তানি পাসপোর্ট ও বাংলাদেশী ভিসা নিয়ে দেশে ফেরেন। জিয়াউর রহমান ও পরে বিএনপির খালেদা জিয়া (১৯০১-১৯৯৬) এবং জামাতের মতিউর রহমান নিজামীর জোট সরকার (২০০১-২০০৬) অন্যান্য উগ্র সংগঠনগুলির মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করলেন। তাঁদের আক্রমণে প্রাণ হারালেন অসংখ্য মানুষ। প্রমাদ গুনলেন মুক্তিযোদ্ধা, তাঁদের পরিবার, অসাম্প্রদায়িক, মুক্তমনা এবং শান্তিপ্রিয় মানুষজন। ঠিক এই সময়ে ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে গঠিত হল 'একাত্তর ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি।' সভাপতি হলেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এবং সম্পাদক শাহরিয়র কবির। কমিটির উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকারী ব্যক্তিদের বিচারের আহ্বান জানানো। সরকার তাঁদের দাবিতে সাড়া না দিলে প্রকাশ্য স্থানে নিজেরাই বসালেন জন-আদালত। তাঁদের আহ্বানে সাড়া পড়ল ব্যাপক। জনতার আদালতে সাজা হল দেশদ্রোহীদের। সরকার তাঁদের জেলে ভরলেন। কিন্তু তাঁরা থামেন নি। তাঁদের লাগাতর আন্দোলনের ফলে শেষমেশ অপরাধীদের বিচার ও সাজা হল। অবশ্য তা হল হাসিনা সরকারের তত্বাবধানে। আন্তজার্তিক আইন মেনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। এখানে দুটো কথা বলা বড্ড প্রাসঙ্গিক হবে বলেই মনে করছি। এক- ঠিক যে সময়ে আন্তর্জাতিক স্তরের অপরাধীদের বাংলাদেশের জেল থেকে ইউনুস সরকার বের করে নিয়ে আসছে, ঠিক তখনই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে শাহরিয়র কবিরের মতো মানুষকে। দুই- ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির প্রথমদিকে শাহরিয়র কবিরের সাথে স্বউদ্যোগে কাজ করতে এসেছিলেন এক তরুন, নাম তাঁর আসিফ নজরুল। আর এখন শাহরিয়র কবিরকে যখন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তখন দেশের আইন মন্ত্রকের চেয়ারে বসে আছেন সেই আসিফ নজরুল।

'একাত্তর ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি' সর্বদা ধর্মকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করার বিরোধীতা করেছে এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলিরও বিরোধীতা করেছেন। তাঁরা মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের পক্ষে সরব থেকেছেন। সর্বপ্রকার সংখ্যালঘু মানুষের আধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। গত ১৮ মে, ২০২৪ তাঁদের সম্মেলন থেকে সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য পৃথক আইন প্রণয়নের ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের দাবিও জানিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান সরকারের তাঁরা চক্ষুশূল হয়েই আছেন।

ইতিমধ্যে শাহরিয়ার কবীরের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন পাকিস্তানের মানবাধিকার কর্মী তাহিরা আব্দুল্লা। তুরস্কের কবি, নাট্যকর্মী ও মানবাধিকার আন্দোলনের সংগঠক তারিখ গুনেরসেলও শাহরিয়ার কবিরের গ্রেপ্তারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা উভয়েই বলেছেন বাংলাদেশে পুলিশের হেফাজতে আশা করি তিনি সুরক্ষা পাবেন। তাঁকে গণ প্রহারে নিহত হতে হবে না।

৭১ -এ পাক বাহিনী লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যার সঙ্গে ফ পূর্ব বাংলার মেধা ও মননকেও ধ্বংস করে ফেলতে চেয়েছিল। এখনকার পাকপ্রেমী সরকারও আওয়ামী পন্থীদের সাবাড় করার সাথে সাথে শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি কর্মী, মানবাধিকার কর্মীদের দিকে এগিয়ে আসছে দাঁত-নখ বার করে। শুধু শাহরিয়ার কবির নয়, গ্রেপ্তার হয়েছেন শ্যামল দত্ত, মোজাম্মেল বাবু সহ শতাধিক সাংবাদিক এবং আসাদ্দুজ্জামান নূরের মত সাংস্কৃতিক কর্মী। অন্তরালে দিন কাটাচ্ছেন রোকেয়া প্রাচীর মত অসংখ্য অভিনেত্রী ও অভিনেতা। খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে শাকিব আল হাসান ও মাশরফি মোর্তজার মত আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে। বাক স্বাধীনতা শূণ্য। সবাই তটস্থ। এই বুঝি হেনস্থা, আক্রান্ত কিংবা গ্রেপ্তার হবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার কাজে তো হাত লাগান হয়েছে প্রথম দিকেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হাজার খানেক শিক্ষককে প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। উপদেষ্টামন্ডলী থেকে শুরু করে বিচারালয় ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত নিজেদের লোকজনকে বসানোর বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলছে বি এন পি, জামাত এবং অন্যান্যদের মধ্যে। আন্দোলনের নামে ওরা শত শত পুলিশকে হত্যা করেছে। কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন এখন থানাগুলি চলে যাবে হেফাজতে ইসলাম, জামাতে ইসলাম, হিজবুল তাহরীর স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে।

শেখ হাসিনা পরিচালিত সরকারের জনবিরোধী নীতি সমূহের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত হচ্ছিল। সরকারী চাকুরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের দাবিকে কেন্দ্র করে যে মারমুখী ও সহিংস আন্দোলন শুরু হয় তার জবাব দেওয়া হয় পাল্টা সহিংসতায় এবং এই গোটা পর্বটার শেষ হয় আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর দেড় মাস কেটে গেল, এখনও দেশের মানুষের পক্ষে উপযোগী এমন কোন ভূমিকা উপদেষ্টা সরকারকে গ্রহণ করতে দেখলাম না। যা দেখতে পাচ্ছি তা হল

সরকারের সমর্থক দলগুলির নীতিহীনতা, পারস্পরিক কলহ, খুন-খারাপি, এলাকা দখল ইত্যাদি।

সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ ঃ

সর্বোপরি হিন্দুদের আতঙ্কে রাখা, আদিবাসী ও জনজাতিদের ওপর আক্রমণ।চলছে পীরদের মাজার ও দরগা ভাঙ্গা। আহমেদিয়া ও শিয়া সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ।বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বৃহত্তম সংগঠন' হিন্দু , বৌদ্ধ , খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ 'ঢাকায় সাংবাদিক বৈঠক করে আগস্টের ৪ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত ১৫ দিনে এই সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের ২০১০ টি ঘটনার হিসাব প্রকাশ করেছেন।এই আক্রমণে ১৭০৫ টি সংখ্যালঘু পরিবারের মানুষরা হতাহত হয়েছেন।এর মধ্যে ৩৪ টি আদিবাসী পরিবারও আছেন।শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকেই এই আক্রমণ শুরু হয়েছে।আগাম পোস্টার দিয়ে কিশোরী/ যুবতী /গৃহবধূ অপহরণের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। তাদের কাউকে ফেরত পাওয়া যায় নি। ৪ জন গণধর্ষণের শিকার। ৯ জন নিহত হয়েছেন। ৬৯ টি উপাসনালয়ের ওপর হামলা ও আগুন লাগানোর চেষ্টা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আদিবাসীদের ওপর ১৯/২০ সেপ্টেম্বর একতরফা গুলি চালানোর ফলে অন্তত ৮/১০ জন আদিবাসী নিহত হয়েছেন।

আর আছে অজ্ঞতায় ভরা এক তীব্র ভারত-বিদ্বেষ। আর একটা কাজ তারা মন দিয়ে করছে। আওয়ামী লিগকে শুধু এখনকার মতো শেষ করেই তারা ক্ষান্ত হতে চায় না। ভবিষ্যতে যাতে আওয়ামী লিগ কোনভাবেই মাথা তুলতে না পারে তার নীল নকশা তৈরিই এখন তাদের ধ্যান-জ্ঞান। তাদের নির্বাচনী সংস্কার কমিটির প্রধান বদিউল আলমের কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন কেন আমি এই কথা বলছি। বদিউল সাহেব বলেছেন, গত ১৬ বছরে আওয়ামী লিগের নেতা কর্মী সহ লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্বাচনে কারচুপি করেছেন। তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে, তাদের বিচার করা হবে। এটাই নাকি নির্বাচনী সংস্কার। আবার জুলাই সংঘর্ষের সব দায়ও তারা লীগের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। তারও বিচারও করবে তারা। এরপর সমস্ত শাস্তি ভোগ সমাপ্ত হলে আওয়ামী লিগ দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এটা নাকি রাজনৈতিক সংস্কার'! কিন্তু শুধু নির্বাচনী বা রাজনৈতিক সংস্কারই নয়, এরকম আরও চার রকমের সংস্কার সাধন করা হবে। আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন -কেমন হবে সেসব সংস্কার? কেমন আবার। গত দেড় মাস ধরে তো সংস্কারই চলছে, দেখতে পাচ্ছেন না?

তবে খবর- এইসব সংস্কার আরও নিখুঁত করতে সাহায্য নেওয়া হবে সেনাবাহিনীর। নতুন রোড ম্যাপ। বাস্তবে সামনে থাকবে সৈন্যরা আর পিছনে থাকবে জামাতীরা। ঠিক যেন ৭১ - সামনে পাক বাহিনী, পিছনে জামাতি গ্রুপ। দেশের ১৮ কোটি মানুষ কি করবেন, কোথায় যাবেন, কি খাবেন? মানুষ কোথায় পাবে নিরাপত্তা? কোন পথে হাঁটলে আসবে সম্প্রীতি, পাওয়া যাবে শান্তি?

শুধু একটা কথাই বলতে মন চায়-
কোথায় চলেছ তুমি, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ১৯৩ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে খুনের মামলা

শৈবাল বিশ্বাস

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন পড়শি দেশে তথাকথিত 'বিপ্লবের' পর অর্থাৎ মহম্মদ ইউনুসের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত বেছে বেছে ১৯৩ জন সাংবাদিককে খুনের মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতায় বহুল পরিচিত মুখ যেমন আছে, তেমনই প্রত্যন্ত প্রান্তে সংবাদমাধ্যম চালানো সাংবাদিকও বাদ যাননি। বাংলাদেশ জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তথা ' দৈনিক ভোরের কাগজ' পত্রিকার সম্পাদক শ্যামল দত্ত- ও এই তালিকায় আছেন। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি বৈধ ভিসা নিয়ে সপরিবারে আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে আসতে চান। সেখান থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি চট্টগ্রামে দেশের বাড়ি চলে যান। এর পর তিনি বিমানে দেশ ছাড়তে চেয়েছিলেন। তাঁকে বিমান বন্দরে আটকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতি সম্প্রতি তিনি ও ' একাত্তর টেলিভিশন '- এর সম্পাদক মোজ্জামেল বাবু ময়মনসিংহ দিয়ে স্থলপথে সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলেন। মোজ্জামেল বাবু আবার বাংলাদেশ এডিটর্স গিল্ডের সভাপতি। এঁদের দু জনকে গ্রামীণ এলাকা থেকে আটক করা হয়। পরে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, দু জনকেই খুনের মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

শুধু তাই নয় প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর ও রামেন্দু মজুমদারকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর। একদা নূর ছিলেন শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার সদস্য। শুধু এই কারণে তাঁর মতো বর্ষীয়ান নাট্যব্যক্তিত্বকে গ্রেপ্তার করে খুনের মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় ছাত্র মৃত্যুর সঙ্গে নাকি তিনিও জড়িত! ঢাকার বেলি

রোডের ফ্ল্যাট থেকে তাঁকে অতি সম্প্রতি গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছে।

শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকে বহু সংবাদমাধ্যমের ওপর মৌলবাদীরা হামলা চালিয়েছে। মোজাম্মেল বাবুর 'একাত্তর টেলিভিশন'- এর দপ্তরে বিএনপি ও জামাতের লোকজন সশস্ত্র হামলা চালায়। এই চ্যানেল গায়ের জোরে দখল করে পেটোয়া কিছু লোককে সাংবাদিক সাজিয়ে বসানো হয়। একই কায়দায় গায়ের জোরে ' মাই টিভি', ' নিউজ ২৪', ' সময় টিভি ' দখল করা হয়েছে। ' কালের কণ্ঠ ', ' বাংলাদেশ প্রতিদিন 'সংবাদপত্রের দপ্তরও দখল করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ২৪ টি পত্রিকার দপ্তর মৌলবাদী তথা ' গণ অভ্যুত্থান'- এর সমর্থকদের দখলে চলে গিয়েছে। ঢাকা শহরের ১৫৫ জন ও চট্টগ্রামের ২৮ জন সাংবাদিককে খুন, গণহত্যা, মাদক চোরাচালান সহ আরও নানা মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। নির্বাচিত সভাপতি ও সম্পাদককে সরিয়ে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাব দখল করা হয়েছে। জেলার বহু প্রেসক্লাবের সম্পত্তি এখন জামাতপন্থীদের দখলে। মৌলবাদীদের সেখানে সাংবাদিক সাজিয়ে ঢোকানো হচ্ছে। চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব দখল নেওয়ার জন্য তিনবার হামলা চালানো হয়। ব্যাপক ভাঙচুর, মার ধর চলে। প্রতিরোধ করতে গিয়ে ২০ জন সাংবাদিক আহত হন। সাংবাদিকদের ঘেরাও মুক্ত করতে সেনাবাহিনীকে উদ্যোগী হতে হয়। এত চেষ্টা করেও চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব দখল করা যায়নি। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিভিন্ন জেলার ১২ টি প্রেসক্লাব মৌলবাদীরা পেশীশক্তির জোরে দখল করে নিয়েছে।

সংবাদমাধ্যম যখন চূড়ান্ত ভাবে আক্রান্ত তখন মহম্মদ ইউনুসের সরকার কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটেছে। মুখে তারা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার কথা বললেও কার্যত সে দেশ এখন ফ্যাসিস্ট মৌলবাদী শক্তির পদানত। সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় শঙ্কার প্রহর গুনছে। প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী, বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকরা প্রতি মুহূর্তে আক্রমণের শিকার হচ্ছেন।

এই বাংলার সাংবাদিক হিসাবে আমরা উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। এই আক্রমণের প্রভাব শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এনটা নয়, গোটা উপমহাদেশের স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপরে এটা বড় আঘাত। আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না বাংলাদেশকে স্বাধীন করার প্রশ্নে ও সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কলকাতার সাংবাদিক ও কলকাতা প্রেসক্লাবের অবদান। আমি সেই অবস্থান বজায় রেখে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের ওপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছি।

চিত্রনায়ক নাঈম ঢাকায় জিন্নাহর মৃত্যুবার্ষিকী পালন নিয়ে যা লিখলেন

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ ঢাকায় পাকিস্তানের জাতির পিতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ৭৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন নিয়ে মুখ খুলেছেন ঢালিউড চিত্রনায়ক নাঈম। ফেসবুকে এ বিষয়ে একটি স্ট্যাটাস শেয়ার করেছেন তিনি।

নবাব সলিমুল্লাহ একাডেমির ব্যানারে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে পাকিস্তানের জাতির জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। বুধবারের (১১ সেপ্টেম্বর) এ অনুষ্ঠানের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নিয়ে ভক্তদের স্পষ্ট ধারণা দিতে ফেসবুক পোস্ট দেন নাঈম। ঢাকার নবাব পরিবার খাজা সলিমুল্লাহর বংশধর তিনি। তাই বৃহস্পতিবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ফেসবুকে জিন্নাহর মৃত্যুবার্ষিকী পালনের একটি ছবি পোস্ট করেন অভিনেতা।

যার ক্যাপশনে বড় করে নাঈম লেখেন, ঢাকার নবাব পরিবার এটা সাপোর্ট করে না। স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, আমি খাজা নাঈম মুরাদ নওয়াব সলিমুল্লাহর পৌপুত্র এবং গর্বিত বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমি এমন কোনো গোষ্ঠী বা কার্যকলাপের সাথে যুক্ত নই যা আমাদের জাতীয় পরিচয় বা ইতিহাসকে ক্ষুণ্ন করে। নবাব সলিমুল্লাহ একাডেমি'র সাথে আমাদের ঢাকা নবাব পরিবারের কোনো সম্পর্ক নাই এবং এদের প্রচারিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আমরা অবস্থান করি।

দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নাঈম লেখেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা, ২০২৪ সালের ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানের প্রতি যে কোনো কর্মকাণ্ড যা জনসাধারণের আশা এবং মূল্যবোধের বিরোধিতা করে আমি তা সমর্থন করি না। আমি বাংলাদেশের ছাত্র জনতার এবং তাদের স্বার্থের প্রতি দৃঢ়ভাবে অবস্থান করি।

এ প্রসঙ্গে নাঈমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, নবাব সলিমুল্লাহ বড় একটা ফ্যাক্ট। এই নাম দিয়ে অনেকে সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের পরিবার এই সংগঠন সম্পর্কে স্পষ্ট জানেই না।

ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিনেতা আরো বলেন, নবাব সলিমুল্লাহ একাডেমির ব্যানারে যারা এটা করেছেন তারা কেবল তাদের স্বার্থ রক্ষায় করেছেন। আমাদের নবাব পরিবারের সঙ্গে এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আমরা এটা প্রত্যাশা করি না। যারা করেছেন তারা অন্যায় করেছেন। আমি অনুরোধ করব, আমাদের নাম নিয়ে এ ধরনের কর্মকাণ্ড করলে

তা আমরা কঠোরভাবে প্রতিহত করব।

প্রসঙ্গত, পুরান ঢাকার আহসান মঞ্জিল ছিল ঢাকার নবাব পরিবারের পারিবারিক বাসস্থান। চিত্রনায়ক নাঈম এ নবাব পরিবারের বংশধর। দেশের চলচ্চিত্র ও অভিনয়ের প্রতি আলাদা টান ছিল তার। তাই নব্বই দশকে ঢালিউড সিনেমায় পা রাখেন তিনি।

বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলোচনা সভার পাশাপাশি উর্দু গান-কবিতা পরিবেশন করা হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ একাডেমি আয়োজিত সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। এতে তিনি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার কামরান ধাঙ্গাল উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উর্দু ভাষায় দেয়া এক ব্যক্তির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম এসকে আজিম। তিনি ঢাকার একটি বিহারি ক্যাম্পের বাসিন্দা। তবে তার পরিচয় নিশ্চিত হতে পারেনি।

১ মিনিট ১৭ সেকেন্ডের ভিডিওতে ওই ব্যক্তি উর্দুতে যা বলেন, তার বাংলা অনেকটা এরকম, ১৫-১৬ বছর পর আমরা এখানে উর্দু ভাষায় কথা বলছি এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারছি। এ জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজকদের ধন্যবাদ। মিরপুর-মোহাম্মদপুরে আমাদের বাপ-দাদারা বসবাস করতেন, তারা পাকিস্তানের পক্ষে মারা গেছেন। ভারত থেকে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান হয়েছিল এই দেশ। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব না থাকলে এশিয়া মহাদেশে মুসলিমদের জন্য কোনো দেশ থাকত না। তার জন্য আমরা পাকিস্তান পেয়েছি, যেখানে আমরা মুসলমানরা সম্মানের সাথে ধর্মপালন করতে পেরেছি। ১৯৭১ সালে ভারত যুদ্ধ করে আমাদের এ দেশকে দুভাগ করে দিয়েছে। পঞ্চাশ-ছাপ্পান্ন বছর ধরে আমাদের বাপ-দাদারা এই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে গেছেন। এজন্য আজ আমাদের এখানে পাকিস্তানের সবাইকে দেখে আর এ অনুষ্ঠানে এসে খুব খুশি লাগছে। ইনশাআল্লাহ, আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে নাগরিক পরিষদের আহ্বায়ক মো. সামসুদ্দিন বলেন, ৫ আগস্ট আমাদের বিজয় দিবস, এটিই আমাদের স্বাধীনতা দিবস। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার কামরান ধাঙ্গাল বলেন, মুসলিম লীগে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্ব ছিল অসাধারণ। সমগ্র ভারতে মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গণআন্দোলনের সূচনা ছিল এটি।বারাণসীর রাজঘাটে আচার্য বিনোবা ভাবে প্রতিষ্ঠিত সর্বসেবা সংঘের প্রবেশপথে ১০০ দিনের সত্যাগ্রহ শুরু

আচার্য বিনোবা ভাবে প্রতিষ্ঠিত সর্বসেবা সংঘের প্রতিবাদী সত্যাগ্রহ

রোসাম্মা টমাস

হয়েছে। সারা দেশের ১০০ টি জেলা থেকে আগত অহিংস গান্ধীবাদী কর্মীরা পালা করে সর্বসেবা সংঘের জমি পুনরুদ্ধার করতে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন। উত্তর প্রদেশ সরকার ও নর্দার্ন রেলওয়ে কর্তৃক অবৈধ জমি দখল ও সর্বসেবা সংঘের কুটিরসমুহ ধ্বংসের জন্য, আইন দ্বারা প্রদত্ত শাস্তির দাবিতে এই সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছে। সর্বসেবা সংঘের সদর দফতর থেকে, গান্ধীজির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিনোবা ভাবে ১৯৪৮ সালে নিবন্ধিত এই সমিতি গঠন করেন। হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে। দেশবাসীর মধ্যে মহাত্মার অহিংসা, সম্প্রীতি,ত্যাগ ও ভালোবাসার বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আচার্য্য বিনোবা ভাবেকে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বতোভাবে সহায়তা করেন রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী,জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ।

ছয় দশকের বেশী পুরাতন এই সর্ব সেবা সংঘের আশ্রমে ছিল একটি ছাপাখানা যেখান থেকে অতি স্বল্পমূল্যে গান্ধীজির চিন্তা সমন্বিত পুস্তিকা প্রকাশ করা হত। এছাড়া ছিল দরিদ্র ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একটি অবৈতনিক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও একটি গ্রন্থাগার। একটি অনাথ ও দুঃস্থ ছাত্রদের আবাসিক আশ্রম।রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী ২.৫ একর জমি সর্ব সেবা সঙ্ঘ ৬৫ বছর আগে রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের অনুমোদন ক্রমে রেলওয়ের কাছ থেকে ক্রয় করেন। সর্ব সেবাসংঘের কাছে সমস্ত বৈধ কাগজপত্র আছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার উচ্ছেদের নির্দেশ দিলে প্রবীণ গান্ধীবাদীরা জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করে ওই নির্দেশ প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন।কিন্তু গত বছর ২৩ জুলাই গায়ের জোরে বারাণসী প্রশাসন ওই আশ্রম দখল করে। বুলডোজার চালিয়ে বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার সব ভেঙে দেয়। তারপর ওই জমি তারা রেল কে দেয়। তারা সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ইন্দিরা গান্ধী নেশনাল সেন্টার ফর আর্টস গঠন করবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ইন্দিরা গান্ধীর নাম হলেও এই সংগঠনটি পরিচালনা করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ।

গত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ শুরু হওয়া এই ১০০ দিনের সত্যাগ্রহে দেশের ১০০ টি জেলার সত্যাগ্রহীরা অনশনে যোগ দেবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ গান্ধীবাদীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে আসছেন , যাদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং তারা এখন জমি পুনরুদ্ধারের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করছেন।

সর্বসেবা সংঘ, তাদের স্বল্পমূল্যের বই মুদ্রণের মাধ্যমে

পাঠকদের গান্ধী, বিনোবা ভাবে এবং সর্বোদয় আন্দোলনের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত করাচ্ছিল এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের লক্ষ্য হিসাবে মর্যাদা ও ন্যায়পরায়ণতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।গান্ধীজির সর্বদয় ও অহিংসার মতবাদ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পরিচালিত।

প্রতিষ্ঠানটির যে কাঠামোটি ছিল তা ভেঙ্গে ফেলা এবং সেখানে আমন্ত্রিত গান্ধীবাদীদের ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করা স্পষ্টতই গান্ধীবাদী আদর্শের ওপর আক্রমণ । তবে গান্ধীর আদর্শ ভারতে মৃত নয়। প্রাক্তন এনসিইআরটি প্রধান অধ্যাপক কৃষ্ণ কুমারের একটি নতুন বই এই মাসে প্রকাশিত হয়েছে, কথাসাহিত্যে গান্ধীকে স্মরণ করে। শত শত যুবক , পৌঢ় ও বৃদ্ধ, বারাণসীর দখলকৃত জমি ফেরত দেওয়ার দাবিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে একত্রিত হবেন। দাবি তুলবেন , সর্বসেবা সংঘকেআশ্রম ভাঙার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সর্বসেবা সংঘও বিষয়টি নিয়ে আদালতে লড়ছে। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে।

সরকারের ভূমিকা বিনোবা ভাবের স্মৃতিকে উপহাস করে, যিনি ১৯১৭ সালে গান্ধীর অনুগামী হয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বেশ কয়েক বছর জেলে কাটিয়েছিলেন, আইন অমান্যের জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন। ১৯৬০ এবং মে, ১৯৭০-এর মধ্যে তিন কিস্তিতে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। বারাণসীতে সর্বসেবা সংঘের লাইব্রেরিতে বিক্রির প্রমাণপত্র সংরক্ষিত ছিল, যা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং ওই প্রাঙ্গণে বর্তমানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

আদালতের কার্যক্রমে জড়িত গান্ধীবাদীরা উদ্বেগের সাথে উল্লেখ করেছেন যে সিভিল ডিক্লারেশন স্যুটের আদেশ - একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আদালত একটি শিরোনাম ঘোষণা করতে পারে, যেখানে মালিকানা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে - শুনানির সময় একাধিকবার পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল; পাঁচ বিচারপতিকে বদলি করা হয়েছে। এদিকে এ বিষয়ে মূল মামলার শুনানি বাকি রয়েছে। গান্ধীবাদীরা বিশ্বাস করে যে তাদের পক্ষে ডকুমেন্টারি প্রমাণ অপ্রতিরোধ্য, এবং একটি সঠিক শুনানি সরকারের পক্ষ থেকে সন্দেহজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রকাশ করবে।

এই প্রতিবেদকের দ্বারা এই বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার কোন চেষ্টা করা হয়নি, একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি সরকারের কাছ থেকে কী আশা করা যায় যিনি ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে একবারও সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেননি ? ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ -এ, প্রধানমন্ত্রী তার জন্মদিন উদযাপন করার সময়, সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে এমনকি একটি অবৈধ ধ্বংসের ঘটনাও সংবিধানের নীতির বিরুদ্ধে ছিল।

চার বছর জেলবন্দি উমর খালিদ

শুভাশিস মজুমদার

চার বছর ধরে ইউএপিএ আইনে কার্যত বিনা বিচারে বন্দি ইতিহাসের মেধাবী গবেষক উমর খালিদ। তাঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র 'কয়েদি নম্বর ৬২৬৭১০' তৈরি হয়েছে।

২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার সাথে সম্পর্কিত একটি ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারের অপেক্ষায় থাকা মানব অধিকার কর্মী উমর খালিদের কারাগারে চতুর্থ বছর চিহ্নিত করতে ১৩ সেপ্টেম্বর,শুক্রবার, বেশ কয়েকজন ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় (প্রতিবাদী) মন্তব্য ও পোস্ট করেন।

খালিদ সহ আরও ১১ জন বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (ইউএপিএ) অধীনে একটি মামলায় কারাগারে রয়েছেন। যদিও সুপ্রিম কোর্ট বেশ কয়েকটি মামলায় একাধিকবার বলেছে, 'জামিন হল নিয়ম এবং জেল একটি ব্যতিক্রম।' সম্প্রতি একটি দুর্নীতির মামলায় আম আদমি পার্টির বিধায়ক মনীশ সিসোদিয়াকে জামিন দেওয়া হয়েছে। জামিন পেয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সন্ত্রাসবাদী ফ্যান্ডিংয়ের কাজে অভিযুক্ত হিসেবে বন্দি থাকা কাশ্মীরের ইঞ্জিনিয়ার রশিদকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। খালিদের উপর ললিত ভাচানির ডকুমেন্টারি ; প্রিজনার নং ৬২৬৭১০ ইজ প্রেজেন্ট; তাঁর গ্রেপ্তারের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লিতে কংগ্রেসের জওহর ভবন অডিটোরিয়ামে প্রদর্শিত হয়েছে।

একই সঙ্গে বেশ কিছু ব্যক্তি তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া ডিসপ্লে (ডিপি) - র ছবিগুলিকে বার্তা সহ খালিদের ছবিতে পরিবর্তন করেছেন তঅন্যায়ের চার বছর। উমরের মুক্তি দাও ! সকল বিরোধিতাকারীদের মুক্তি দাও।

অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর এক্স-এ পোস্ট করেছেন 'আজ জামিন, বিচার বা অপরাধ ছাড়াই উমরখালিদের কারাবাসের ৪ বছর পূর্ণ হচ্ছে। একটি গণতান্ত্রিক বলে মনে করা দেশে এটি একটি প্রতারণা। এটা আমাদের বিচার ব্যবস্থার জন্য লজ্জাজনক এবং বিব্রতকর দলিল।'

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে স্বরা আরো বলেন যে উমর খালিদ, শারজিল ইমামদের জেলবন্দি করা তাঁদের ধর্মের (মুসলিম) কারণে সুবিধা হয়েছে। এমনকি, শুধুমাত্র জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেই তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়নি বলে দাবি করেছেন স্বরা।

আরও বেশ কয়েকজন প্রাক্তন জেএনইউ গবেষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ফটো এবং পোস্টার সহ একই রকম বার্তা

পোস্ট করেছেন।

অ্যাকাডেমিক এবং অ্যাক্টিভিস্ট যোগেন্দ্র যাদব এক্স-এ একটি ভিডিও বার্তা পোস্ট করেছেন 'এই চার বছর আমাদের বিচার ব্যবস্থায় এবং ভারতের সংবিধানে একটি দাগ।'

যুব হাল্লা বোল আন্দোলনের অনুপম এক্স-এ খালিদের কাছ থেকে ২০২২ সালে পাওয়া একটি চিঠি পোস্ট করেছেন।

অনুপম বলেন 'আমার বন্ধু খালিদ জেলে চার বছর পূর্ণ করেছে। অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলনের সময় আমাকে যখন তিহার জেলে পাঠানো হয়, তখন তিনি এই সুন্দর চিঠিটি লিখেছিলেন। আমি এখন জেলের বাইরে আছি, কিন্তু সে কোনো অপরাধের বিচার বা জামিন ছাড়াই অন্যায় (নির্যাতন) ভোগ করছে।'

উমরকে নিয়ে ছবিটিতে মহারাষ্ট্রের সেই তথাকথিত বিতর্কিত বক্তৃতাটি দেখানো হয়েছে। তাতে উমর গান্ধির পথে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথাই বলছেন।

ছবিতে উমরের সহযোদ্ধারা বলেছেন, জেলে ইতিমধ্যে গোগ্রাসে ২০০টির বেশি বই পড়ে ফেলেছেন উমর। কবে ছাড়া পাবেন তাঁরা উত্তর নেই। তবু এই কঠিন সময়েও সুরসিক উমরের সঙ্গে জেলে সাপ্তাহিক মোলাকাতে উজ্জীবিত বোধ করেন সহযোদ্ধারা। শুধু উমরের জন্য নয়, দেশে গণতন্ত্র বাঁচাতেই উপনিবেশ যুগের ইউএপিএ-র বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার তাগিদ মনে করান তাঁরা।

উমরের অন্য সহযোদ্ধা শরজিল ইমাম, গুলফিসা ফাতিমা, মিরান হায়দর, শিফা-উর-রহমান, খালিদ সৈফি, মহম্মদ সালিম খানদের 'কালা কানুনে' (ইউএপিএ) বন্দি থাকার কথা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। উমরকে নিয়ে ললিত ভাচানির তৈরি ছবিটিও মনে করাচ্ছে, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে খেসারত দেওয়া এই নামগুলি সকলেই মুসলিম।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আট বছরে আগে জেএনইউ-এর ছাত্র উমর সরস ভঙ্গিতে পথসভায় বলছেন, ''আমার নাম উমর খালিদ, কিন্তু আমি জঙ্গি নই। আমি তো নিজের মুসলিমত্ব নিয়ে আলাদা করে ভাবতামই না। কিন্তু মুসলিম পরিচয়টাই আমার গায়ে সেঁটে দেওয়া হল।'' ২০১৯-এর নাগরিকত্ব আন্দোলনের বিভিন্ন 'মুখ'কে দেশদ্রোহী প্রতিপন্ন করা হলেও ছবিতে ২০১৯-২০র বক্তৃতা সভায় উমর বলছেন, ''আমি গর্বিত ভারতীয় মুসলিম। ঘটনাচক্রে নয়, স্বেচ্ছায়। জিন্না নয়, আমার নেতার নাম গান্ধি, আজাদ, অম্বেডকর।''

উমরকে নিয়ে ছবিটা কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন শহরে ৪৫ বার দেখানো হয়েছে। বার বার নতুন লোক দেখছেন। উমরদের পাশে অনেকেই আছেন, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

স্মরণ ঃ

প্রাবন্ধিক-গবেষক গোলাম মুরশিদের জীবনাবসান

বরেণ্য লেখক ও গবেষক অধ্যাপক ড. গোলাম মুরশিদ মারা গেছেন।গত ২২ আগস্ট বৃহস্পতিবার লন্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট এই প্রাবন্ধিক পুরানো বাংলা গদ্য নিয়ে গবেষণা করতেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন।

বাংলা একাডেমির পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) তপন বাগচী সামাজিক মাধ্যম ফেইসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তার মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, 'আজ (বৃহস্পতিবার) বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪টা এবং লন্ডন সময় সকাল ১১টায় ইংল্যান্ডের লন্ডনে কুইন্সে হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এ সময় পাশে ছিলেন স্ত্রী এলিজা মুরশিদ এবং কন্যা বিপাশা গার্গী মুরশিদ (অমিতা)।'

ফেইসবুকের ওই পোস্টে তপন বাগচী আরও লিখেছেন, 'তার ছেলে পাণিনি মুরশিদ (অন্তু) বর্তমানে আমেরিকায় অবস্থান করছেন। তিনি লন্ডনে পৌঁছানোর পর গোলাম মুরশিদকে লন্ডনেই সমাহিত করা হবে বলে জানা গেছে।'

১৯৪০ সালের ৮ এপ্রিল বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন গোলাম মুরশিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন তিনি।

এরপর ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় দুই দশক তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

লন্ডনের বিবিসি বাংলা বিভাগে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন তিনি। এছাড়া ১৯৯১ সাল থেকে লন্ডনে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণায় জড়িত ছিলেন।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের গবেষণা-সহযোগী ছিলেনও তিনি। ভয়েস অব আমেরিকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি কণ্ঠ দিতেন। অবসর জীবনে মূলত তিনি লন্ডনেই বাস করছিলেন।

১৯৭৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ থেকে পিএইচডি করেন গোলাম মুরশিদ। তার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ডেভিড কফ। 'হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক' নামে এই

গবেষণাকর্মটি প্রকাশিত হয় বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮৪ সালে। ২০২১ সালে ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে একুশে পদক লাভ করেন গোলাম মুরশিদ। এর আগে প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্য ১৯৮২ সালে তিনি পান বাংলা একাডেমি পুরস্কার। তিনি 'হাসান মুরশিদ' ছদ্ম নামেও লিখতেন।

তার লেখা উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে- 'রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা', 'রাসাসুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর', আশার ছলনে ভুলি, 'আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমনী' 'বাংলা ভাষার উদ্ভব ও অন্যান্য', 'বাংলা গানের ইতিহাস', 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত নজরুল-জীবনী', 'আঠারো শতকের গদ্য ইতিহাস ও সংকলন', 'মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস', 'সংকোচের বিহ্বলতা', 'যখন পলাতক', 'কালান্তরে বাংলা গদ্য', 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদি-পর্ব' ইত্যাদি।

এছাড়া বাংলা একাডেমি থেকে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান'।

সিপিআই (এম) নেতা সীতারাম ইয়েচুরি (১৯৫২ - ২০২৪)

গত ১২ সেপ্টেম্বর সিপিআই (এম) দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসীতারাম ইয়েচুরির প্রয়াণ শুধু সিপিআই (এম) দলেরই নয়, দেশের পক্ষেও এক অপূরণীয় ক্ষতি। ভারতীয় সমাজ , অর্থনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রগাঢ় জ্ঞান। দেশের সামগ্রীক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে সর্বদাই তাঁর মেধার পরিচয় পাওয়া যেত। মৃত্যুকালে রেখে গেলেন স্ত্রী সীমা, এক কন্যা ও এক পুত্রকে। বড় ছেলে আশীষ তিন বছর আগে কভিদ হয় মারা যান।

এক তেলেগুভাষী পরিবারে ১৯৫২ সালে সীতারামের জন্ম। বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, মা সরকারি চাকরি করতেন। ছোট থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সি.বি.এস.ই'র দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় তিনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। দিল্লির সেন্ট স্টিফেনস কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। শ্রী ইয়েচুরি দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে (জে.এন.ইউ) অর্থনীতি নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ার জন্য ভর্তি হন। স্নাতকোত্তর পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। জে.এন.ইউ. তে পড়ার সময়কালকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা পর্ব বলা যায়।এখানে পড়ার সময় তিনি ১৯৭৪ সালে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনে (SFI) যোগ দেন ও সহযোদ্ধারুপে পান প্রকাশ কারাতকে। JNU তে পড়ার সময় কম ইয়েচুরি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত দুইবার সভাপতি নির্বাচিত হন। JNU তে তিনি ও প্রকাশ কারাত SFI কে এক শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন যা এখনও বজায় আছে। তিনি JNU তে যখন ছাত্র নেতা তখন ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে পরাস্ত হন। ইয়েচুরি অসংখ্য ছাত্রকে নিয়ে ইন্দিরা গান্ধির বাসভবনে যান JNU এর আচার্য পদ থেকে তাঁর পদত্যাগ দাবি করতে। ইন্দিরা গান্ধী পাঁচ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে আসতে বলেন। তিনি বলে পাঠান তার সঙ্গে ৫০০ ছাত্র এসেছে, তিনি কী করে পাঁচ জনকে নিয়ে আসবেন? এবার শ্রীমতী গান্ধী নিজে বাড়ির বাইরে আসেন। ইয়েচুরি তাঁকে স্মারকলিপিটি পরে শোনান। তিনি সেটি শোনেন ও গ্রহণ করেন। এর পর শ্রীমতী গান্ধী আচার্য পদ থেকে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। এর থেকে ওই অল্পবয়সেই ইয়েচুরির নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা বোঝা যায়। একই সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী SFI নেতার প্রতি কতটা শালীনতা ও ভদ্রতা দেখিয়েছিলেন তাও বোঝা যায়, আজকের দিনে যা অভাবনীয়।

সীতারাম ১৯৮২ সালে SFI এর সর্ব ভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন।১৯৮৪ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন মাত্র ৩২ বছর বয়সে। ১৯৮৯ সালে তিনি পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। ১৯৯২ সালে পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য হন।সেই থেকে তিনি পলিটব্যুরোতে আছেন।২০১৫ সাল থেকে তিনি আমৃত্যু পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি দুই দশক পার্টির মুখপত্র Peoples Democracy 'র সম্পাদক ছিলেন।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে আসার সুবাদে, পার্টির সাধারণ

সম্পাদক হরকিষেন সিং সুরজিৎ ইয়েচুরিকে অন্য দলের সঙ্গে আলোচনা করতে পাঠাতেন। ১৯৮৯ সালে একদিকে বিজেপি ও অন্যদিকে সিপিআই(এম) ও বামদলগুলির সমর্থনে ভি.পি.সিং (জনতা দল) কংগ্রেসকে হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী হন। ওই নির্বাচনের আগে বিজেপির গোবিন্দাচার্যর মাধ্যমে সমঝোতার খুঁটিনাটি বিষয় গুলি দেখতেন শ্রী ইয়েচুরি। ওই নির্বাচনে বিজেপির আসন ২ থেকে বেড়ে ৮৬ হয়। ওই সময় সিপিআই(এম) অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করত। বিজেপির শক্তি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৯২ সালে বিজেপি বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। ১৯৯৬ সালে হাং পার্লামেন্ট হয়। কংগ্রেস, জনতা দল ও বাম দলগুলি মিলে সরকার গঠন করলে বাইরে থেকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রধানমন্ত্রী পদে কংগ্রেস ও জনতাদলসহ অন্য আঞ্চলিক দলগুলি জ্যোতি বসুর নাম প্রস্তাব করে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় সিপিআই(এম) দল জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার বিরুদ্ধে পার্টিতে প্রস্তাব নেয়। এই সিদ্ধান্তকে জ্যোতি বসু বলেছিলেন

'ঐতিহাসিক' ভুল।এর ফলে আঞ্চলিক দল থেকে প্রথমে দেবগৌড়া ও পরে ইন্দ্র গুজরাল প্রধানমন্ত্রী হন।এই সরকারের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি রচনায় ইয়েচুরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। কিন্তু আঞ্চলিক দলগুলির ব্যর্থতা ও সংকীর্ণতায় ওই যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যায়।

১৯৯৮ সালে শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপির সরকার হয়। ছয় বছর পর বিজেপিকে হারিয়ে ২০০৪ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার গঠিত হয়। ড. মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হন। এই সরকারের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি রচনাতেও শ্রী ইয়েচুরি গুরুত্বপূর্ণ পালন করেন। কিন্তু ২০০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক নিউক্লিয়ার এগ্রিমেন্ট করায় সিপিআই (এম) সহ বামদলগুলি কংগ্রেস সরকার থেকে সমর্থন তুলে নেয়। শোনা যায় শ্রী ইয়েচুরি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। এই মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্তের খেসারত সিপিআই(এম) সহ বাম দলগুলিকে আজও দিতে হচ্ছে।

শ্রী ইয়েচুরি দুই টার্ম (২০০৫ থেকে ২০১৭) রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। রাজ্যসভায় বিভিন্ন বিষয় তাঁর ভাষণ সাংসদদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা, শ্রম নীতি, কৃষি সমস্যা প্রভৃতি প্রভৃতি বিষয়ে গভীর দায়বদ্ধতা থেকে তিনি ভাষণ দিতেন। ২০১৫ সালে তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। সেইজন্য তাঁর দল তাঁকে আর দাঁড়াতে দিলনা। এই ধরনের যান্ত্রিক নিয়ম অনুসরণ করার ফলে তাঁর দল প্রভূত ক্ষতিগ্রস্থ হল। রাজ্যসভাও হারালো এক দক্ষ সাংসদকে। রাজ্যসভায় তাঁর ফেয়ার ওয়েলে সব দলের সদস্যরাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার সকলেই ছিলেন গুণমুগ্ধ অনুরাগী। আমার মনে আছে সোস্যালিস্ট দলের বর্ষীয়ান সদস্য অধ্যাপক রামগোপাল যাদব অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কম ইয়েচুরিকে তৃতীয়বার মনোনীত না করার জন্য সিপিআইএম দলের সমালোচনা করেন।

দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীইয়েচুরি উপলব্ধি করেছিলেন কংগ্রেসসহ সমস্ত আঞ্চলিক দলগুলির সার্বিক ঐক্য দরকার।' ইন্ডিয়া ' জোট গঠনে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দলের তিক্ত সম্পর্ক হওয়া সত্বেও ' ইন্ডিয়া ' জোটে টিএমসি ' র থাকা নিয়ে তিনি কখনও আপত্তি প্রকাশ করেন নি। এই রাজ্যে তাঁর দল ২০১১ সালে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়। পরিস্থিতির বাস্তবতা বুঝে ২০১৬ সালে তিনি উদ্যোগ নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করেন। এই সমঝোতা পরাস্ত হলেও তাঁরা একত্রে ৭৭ টি আসনে জয়লাভ করেন।ওই জোট ৩৯ভোট পায়। কিন্তু তাঁর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বাম রক্ষনশীল অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা পার্টির নীতির পরিপন্থী বলে পশ্চিমবঙ্গ পার্টিকে Censor করে। কংগ্রেসের সঙ্গে এই সমঝোতা ভেঙে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে পার্টি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ এখন বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস -এই দ্বিমেরু বিশিষ্ট রাজ্যে পরিণত হয়েছে। শ্রী ইয়েচুরি এই অবস্থা থেকে পার্টিকে বার করে আনতে পারেন নি।

সব শেষে এই কথাটি বলতে হয় যে শ্রী সীতারাম ইয়েচুরি ছিলেন সেই বিরল প্রজাতির কমিউনিস্ট নেতা যিনি শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

কমঃ সীতারাম ইয়েচুরি দীর্ঘজীবী হন।

-শান্তনু দত্ত চৌধুরী